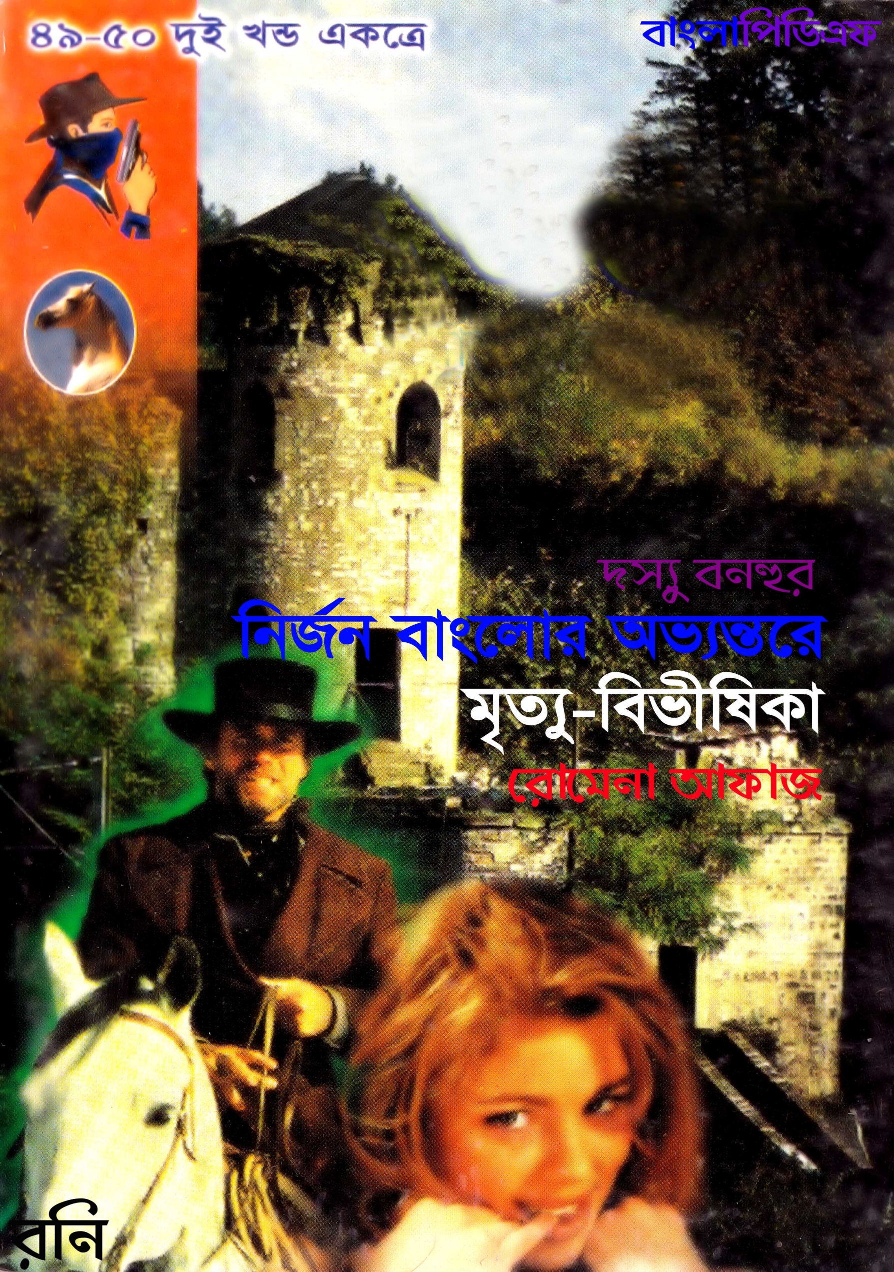
৪৯-৫০ দুই খন্ড একত্রে
বাংলাপিডিএফ
দস্যু বনহুর
নির্জন বাংলোর অভ্যন্তরে
মৃত্যু-বিভীষিকা
রোমেনা আফাজ
রনি

নির্জন বাংলোর অভ্যন্তরে-৪৯
মৃত্যু-বিভীষিকা-৫০

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

নির্জন বাংলোর সম্মুখে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো মিঃ কাওসারী, তারপর গাড়ির দরজা খুলে বললো—আসুন মিস্ হামিদা......মিঃ কাওসারী মিস্ হামিদার হাত ধরে নামিয়ে নিলো। খুলে দিলো মুখের রুমাল— আসুন আমার সঙ্গে।

মিঃ কাওসারী অগ্রসর হলো নির্জন বাংলোর দিকে।

মিস্ হামিদা রিজভী বাধ্য হলো তাকে অনুসরণ করতে। চোখেমুখে তার ভীতিভাব ফুটে উঠেছে।

বাংলোটা কান্দাই শহরের কোন্ জায়গায় সঠিক বলা মুশ্কিল। বহুকালের পুরানো বাংলো। সংস্কার অভাবে বাংলোর দেয়ালের চুনবালি খসে পড়েছে, স্থানে স্থানে আগাছা জন্মেছে। বাংলোর আশেপাশে কোনো লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

বাংলোর কক্ষের সম্মুখে এসে থামলো মিঃ কাওসারী, ফিরে তাকালো মিস্ হামিদার দিকে। রাত গভীর হলেও চাঁদের আলোতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিলো সব।

মিঃ কাওসারীর শহরের বিভিন্ন পথে গাড়ি চালিয়ে কান্দাই-এর শেষ প্রান্তে এই নির্জন বাংলোয় পৌঁছতে বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে গিয়েছিলো। মিঃ কাওসারী যখন পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণের উৎসব থেকে মিস্ হামিদা রিজভীকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসেছিলো তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে ন'টা বেজেছিলো মাত্র। এখন রাত একটা পঁচিশ।

মিস্ হামিদা রিজভী বললো—আপনি কে? আর কেনই আমাকে এভাবে এখানে নিয়ে এলেন?

মিঃ কাওসারী বললো—সব জানতে পারবেন। আসুন। দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো সে।

মিস্ হামিদা রিজভীও প্রবেশ করলো তার সঙ্গে।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে চমকে উঠলো মিস্ হামিদা—জমাট অন্ধকারময় চারিদিক। মিঃ কাওসারী অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে।

মিস্ হামিদা রিজভী স্পষ্ট শুনতে পেলো মিঃ কাওসারী দিয়াশলাই জ্বাললেন। আলোকিত হয়ে উঠলো কক্ষটা। অবাক হলো মিস্ হামিদা, কক্ষটার বাইরে থেকে সেটাকে যতই পুরানো জীর্ণ মনে হোক, ভিতরটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন।

মিঃ কাওসারী দিয়াশলাইর কাঠি জ্বেলে মোমবাতি জ্বালালো। ফিরে দাঁড়াবার পূর্বেই মাথার ক্যাপ খুলে হাতে নিলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে মিস্ হমিদা রিজভী অস্ফুট কণ্ঠে বললো— আপনি। সওদাগর জাহাঙ্গীর আলী।

ও, চিনে নিয়েছো তাহলে ইরানী?

হাঁ, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন, কোনো দিনই ভুলবো না আপনাকে।

কিন্তু আজ তোমার জীবন রক্ষার্থে এখানে নিয়ে আসিনি ইরানী। তোমার বাবা আমাকে জব্দ করতে চেয়েছিলো, তাই তার মেয়েকে হরণ করে আমি জব্দ করেছি। এখন ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে হত্যাও করতে পারি।

মিঃ কাওসারীর কথাবার্তায় অবাক হয়ে চেয়ে রইলো ইরানী, তার কথাগুলো যেন কেমন হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হচ্ছিলো, বললো এবার সে— আমি বুঝতে পারছি না আপনার কথাগুলো। আমার বাবা আপনাকে জব্দ করতে চেয়েছিলো, এ কেমন কথা? আপনিই বা আমাকে এভাবে হরণ করে এনে কিভাবে আমার বাবাকে জব্দ করেছেন?

তোমার বাবা মনসুর ডাকু চেয়েছিলো দস্যু বনহুরকে হত্যা কিংবা বন্দী করতে......কিন্তু দস্যু বনহুরকে বন্দী করা যত সহজ মনে করেছিলো সে, তত সহজ নয়, বুঝলে?

আপনি......আপনিই দস্যু বনহুর? ইরানীর দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে। নির্বাক হয়ে যায় তার কণ্ঠ।

বনহুর মাথার ক্যাপটা হাতে খুলে নিয়েছিলো, এবার ক্যাপটা টেবিলে রাখে। একটু হেসে বলে— খুব অবাক হয়েছো দেখছি।

হাঁ, আমি ভাবতে পারিনি আপনিই দস্যু বনহুর।

কেন, অসম্ভব কিসে?

আমি জানতাম, দস্যু বনহুর যেমন ভয়ঙ্কর নাম, তেমনি ভয়ঙ্কর দেখতে... হঠাৎ যেন ইরানী ক্ষেপে উঠলো ভীষণভাবে, গম্ভীর কণ্ঠে

বললো— আমার বাপুকে তুমি কম নাজেহাল করোনি, আমি নিজেও তোমাকে খুঁজে ফিরছি অনেকদিন থেকে। ইরানী বনহুরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে শুরু করলো।

তাই নাকি? বললো বনহুর।

হাঁ। তাছাড়া আমার বাপুর গোপন আস্তানার বন্দীশালা থেকে তুমি তোমার সন্তানসহ পালাতে সক্ষম হয়েছিলে।

সত্যি কথা।

আজি আবার তুমি ছদ্মবেশ ধারণ করে আমাকে হরণ করে এনেছো। আমার বাপুকে তুমি বারবার এভাবে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছো। আমার বাপুর হাতে তোমার নিস্তার নেই কিছুতেই।

এ জন্য আমি অত্যন্ত ভীত, আশঙ্কিত হয়ে পড়েছি ইরানী। তাছাড়া তুমি যখন আমাকে খুঁজে ফিরছিলে তখন আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। এবার খুঁজে পেয়েছো, বলো কি প্রয়োজন আমাকে?

তোমাকে আমি পূজা করবো বলে খুঁজিনি, আমার বাপুর প্রতি তুমি যে অন্যায় আচরণ করেছো তার প্রতিশোধ নেবো। .....

ও, এই কথা। বেশ, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে বন্দী করতে পারো; কিন্তু তোমার প্রাণরক্ষক আমি, এ কথাও যেন ভুলে যেও না।

একদিন আমি তোমাকে চিনতে না পেরে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি।

না হলে কি করতে?

যদি জানতে পারতুম তুমিই দস্যু বনহুর তাহলে আমি তোমার সাহায্য কিছুতেই গ্রহণ করতাম না।

বটে।

হাঁ, দস্যুকন্যা হলেও আমি তোমাকে... ... ...

থামলে কেন, বলো?

আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

চমৎকার! দস্যু হয়ে দস্যুকন্যার কাছে এর বেশি কি আশা করতে পারি?

ঠিক সেই মুহূর্তে ইরানী কাপড়ের আড়াল হতে একটা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বের করে বসিয়ে দিতে গেলো বনহুরের বুকে।

বনহুর ইরানীকে বাধা না দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, তারপর বললো— পারবে না, পারবে না আমার বুকে ছোরা বিদ্ধ করতে।

ইরানীর হাতখানা ছোরাসহ থেমে গিয়েছিলো মাঝপথে। অবাক হয়ে গিয়েছিলো ইরানী বনহুরের হাসি দেখে। এমন করে হাসতে সে তার বাপুকেও দেখেছে। কিন্তু বনহুরের হাসির মত সে হাসি নয়। বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যায় ইরানী, নিজকে সামলে নিয়ে বলে— তোমাকে হত্যা করে আমি দায়ী হতে চাই না, কারণ আমার বাপু তোমাকে তিল তিল করে হত্যা করবে।

সেই দিনের প্রতীক্ষা করো তাহলে।

হাঁ, তাই করবো।

এখন তাহলে বিশ্রাম করো। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নেয় বনহুর— রাত দুটোর বেশি। হাঁ, আমারও বিশ্রামের প্রয়োজন।

বনহুর নিজ শরীর থেকে জামা খুলতে থাকে।

ইরানী নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে বনহুরের দিকে। ভয়-বিস্ময় ফুটে উঠে তার মুখমণ্ডলে।

বনহুর বলে— ইরানী, তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি এই শয্যায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারো। আমি সোফায় বিশ্রাম করবো।

ইরানী তবু নিশ্চুপ যেন সে পাথরের মূর্তি বনে গেছে। দস্যুকন্যা হলেও সে নারী। একটা যুবকের সঙ্গে একই ঘরে কি করে রাত কাটানো সম্ভব।

বনহুর ততক্ষণে জামাটা খুলে আলনায় রেখে এগিয়ে যায় সোফার দিকে।

টেবিলে মোমবাতিটা প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে।

ইরানী দু'পা সরে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো— কি হলো, শয্যা গ্রহণ করবে না?

না।

তবে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকবে?

তাও থাকবো না।

তবে কি করতে চাও?

আমাকে যেতে দাও। যেতে দাও বলছি......

আবার অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বনহুর—যেতে দেবো বলে হরণ করে আনিনি ইরানী। যতদিন তোমার বাবা মনসুর ডাকু আমার বশ্যতা স্বীকার না করবে, ততদিন তোমার মুক্তি নেই।

আমাকে বন্দী করে আমার বাবাকে তুমি বশ্যতা স্বীকার করাতে চাও? কিন্তু মনে রেখো, আমার বাবা তোমার চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। তুমিও দস্যু, বাবাও ডাকু। তুমিও পরের ঐশ্বর্য হরণ করে বিশ্ববিখ্যাত দস্যু হয়েছো, আমার বাবাও তাই...

কাজেই আমরা উভয়ে সমান, এইতো?

ইরানী কথা বলে না, রাগে ফুলতে থাকে সে।

বনহুর সোফায় গা এলিয়ে দেয়।

❑

মনসুর ডাকু আর গোমেশ দস্যু বনহুরকে হত্যা অথবা বন্দী করতে গিয়ে এভাবে পুলিশের হাতে বন্দী হবে, এ যেন তারা ভাবতেই পারেনি। মনসুর ডাকুকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ তার পরিচয় জানতে পেরেছিলো। আরও জানতে পেরেছিলো, মনসুর ডাকুর সঙ্গী তারই প্রধান অনুচর গোমেশ।

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার উদ্দেশ্য নিয়েই মনসুর ডাকু মিঃ হাসেম রিজভীর বেশে নিজকে পরিচিত করে পুলিশ মহলকে এই উৎসবের পরামর্শ দিয়েছিলো। মনসুর ডাকুর অভিসন্ধি ছিলো, পুলিশ মহল দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে সক্ষম না হলেও সে গোমেশের দ্বারা তাকে হত্যা করবে। সব আশা তাঁর বিনষ্ট হয়েছে, দস্যু বনহুরকে হত্যা করা দূরের কথা, নিজেরাই গ্রেপ্তার হলো পুলিশের হাতে। শুধু তাই নয়, ইরানীকে হারাতে হলো। দস্যু বনহুর যে ইরানীকে নিয়ে ভেগেছে তা মনসুর ডাকু ভালভাবেই টের পেয়েছে। মনসুর ডাকু বন্দী হয়ে হিংস্র বাঘের মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো। যত রাগ হলো তার গোমেশের উপর। গোমেশের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায়ই তার সব আয়োজন ব্যর্থ হলো। বন্দী হয়েছে আফসোস নেই তার তেমন কিছু—অমন জেল সে কতবার যে জীবনে খেটেছে, তার ঠিক নেই। আজ যদি দস্যু বনহুরকে হত্যা করে তারা জেলে যেতো তবু শান্তি পেতো।

অবশ্য পুলিশ মহলও জানতে পেরেছিলো যে, তাদের এই উৎসবে স্বয়ং দস্যু বনহুরের আগমন ঘটেছিলো এবং মিঃ জাফরীর অনুপস্থিতির জন্য তাকে কেউ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়নি। সেই সুযোগ নিয়ে দস্যু বনহুর পুলিশের চোখে ধোঁকা দিয়ে নিজে মিঃ কাওসারীর বেশে উৎসবমঞ্চে

আত্মপ্রকাশ করেছিলো। শুধু তাই নয়, হামিদা রিজভিবেশিনী মনসুর ডাকুর কন্যাকে নিয়ে উধাও হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা শহরের সর্বত্র জানাজানি হয়ে যায়।

মিঃ রুস্তমবেশী রহমান সরে পড়েছিলো ততক্ষণে সকলের অলক্ষ্যে। কিছু পরে তার সন্ধান করতে গিয়ে মিঃ হাসান যেন হতভম্ভ হয়ে যান। একটা চিঠি পান তিনি তাঁর সহকারীর হাতে।

মিঃ হাসান চিঠিখানা হাতে নিতেই একটু ধোঁকা লাগলো, তার কারণ এমন সময় কে তাকে চিঠি দিতে পারে? তিনি চিঠিখানা মেলে নিয়ে পড়লেন—

মিঃ হাসান, আপনারা আজ যে দু'জনকে বন্দী করতে পেরেছেন, এরা শুধু দেশের শত্রু নয়, এরা দেশবাসীরও শত্রু—মনসুর ডাকু ও তার প্রধান সহচর। আমি দস্যু বনহুরের প্রধান সহচর রহমান। আপনাদের কড়া পাহারার বেষ্টনী ভেদ করে আমি পালিয়েছিলাম, সেজন্য আমি লজ্জিত।

—রুস্তম

চিঠি পড়া শেষ করে মিঃ হাসান যেন ফেটে পড়লেন— রুস্তম... মিঃ রুস্তম দস্যু বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান? কে এই চিঠি দিলো, শীঘ্র তাকে গ্রেপ্তার করো।

কিন্তু কোথায় সেই রুস্তম! সে তখন পুলিশ অফিসের উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে উধাও হয়েছে।

সমস্ত উৎসব প্রাঙ্গণ এক মহাবিপদ সংকেত ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কে কোন্ দিকে ছুটাছুটি করছে তার ঠিক নেই। মিঃ আরিফ চৌধুরীকে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত মনে হচ্ছে। তিনি মনসুর ডাকু এবং গোমেশকে গ্রেপ্তার করেও যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাঁর যত আক্রোশ দস্যু বনহুরের উপর, তাকে বন্দী না করতে পেরে তিনি যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

এদিকে মিঃ জাফরীর কোনো সন্ধান নেই। উৎসব শুরু হবার পূর্বে তাঁর পুলিশ অফিসে আসার কথা ছিলো। বাসাতে ফোন করেও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ মহলে ভীষণ একটা আলোড়ন শুরু হলো।

পুলিশ ফোর্স ততক্ষণে মনসুর ডাকু ও গোমেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ভ্যানে চাপিয়ে হাজত অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছে।

এখানে পুলিশ মহল যখন নানারকম উদ্বিগ্নতার মধ্যে রয়েছে, তখন নির্জন বাংলোর অভ্যন্তরে দস্যু বনহুর নিদ্রামগ্ন।

মনসুর ডাকুর কন্যা ইরানী শয্যায় শয়ন করে ঘুমিয়ে পড়েছে। যদিও তার ইচ্ছা ছিলো না শয্যা গ্রহণ করে কিন্তু কতক্ষণ সে বসে বসে কাটাবে? একসময় শয্যায় এসে চুপচাপ বসে ভাবছিলো, তারপর কখন যে শুয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই।

রাত গভীর হয়ে আসে একসময়।

বনহুর ফিরে তাকালো খাটের দিকে। ইরানী অঘোরে ঘুমাচ্ছে। হাই তুলে উঠে বসলো সে আলনা থেকে জামটা নিয়ে গায়ে দিলো, ক্যাপটা পরে নিলো মাথায়।

তারপর ঘরের মেঝের এক স্থানে পা দিয়ে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা সিঁড়ির ধাপ জেগে উঠলো। বনহুর সেই সিঁড়ির ধাপে পা রেখে নেমে চললো নিচের দিকে।

ইরানী কিন্তু আসলে ঘুমায়নি, সে ঘুমের ভান করে লক্ষ্য করছিলো দস্যু বনহুরকে।

বনহুর যখন মেঝের একস্থানে পা দিয়ে চাপ দিলো তখন ইরানী মনোযোগ সহকারে দেখে নিলো সব। বনহুর মেঝের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হতেই ইরানী শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, মেঝের যে স্থানে বনহুর পা দিয়ে চাপ দিয়েছিলো, সেই স্থানে ইরানী পা দিয়ে চাপ দিতেই একটি সিঁড়ির মুখ বেরিয়ে এলো।

ইরানী সেই সিঁড়ির উপর পা দিতেই সাঁ করে সিঁড়ি সহ নেমে চললো নিচে। দুলতে লাগলো তার দেহটা, কোনো রকমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো পরিচিত সেই হাসির আওয়াজ। তাকিয়ে দেখলো সে দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা কক্ষের মেঝেতে, সম্মুখে একটা আসনে উপবিষ্ট স্বয়ং দস্যু বনহুর।

হাসি থামিয়ে বলে উঠলো দস্যু বনহুর— ঘুমাওনি তাহলে।

কঠিন কণ্ঠে বললো ইরানী না।

বেশ, এসেছো যখন বসো। পাশের একটা আসন দেখিয়ে বললো বনহুর।

ইরানী কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো আসন ছেড়ে, বললো— এসো তবে আমার সঙ্গে।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো ইরানী— কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?

তুমি না আমাকে বন্দী করতে চাও?

হাঁ, সুযোগ পেলে তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না দস্যু।

চমৎকার উক্তি, দস্যুকন্যার মতই তোমার কথা। কিন্তু কয়েকদিন আমার অতিথি হয়ে তোমাকে থাকতে হবে এবং সেই কারণেই এখন আমার সঙ্গে তোমাকে গমন করতে হচ্ছে।

আমি যদি না যাই তোমার সঙ্গে?

বাধ্য হবো তোমাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যেতে। কিন্তু মনে রেখো দস্যু বনহুর কোনোদিন নারীর অসম্মান করে না। কাজেই তুমি নিশ্চিন্তে আমার সঙ্গে আসতে পারো।

এবার ইরানী বনহুরকে অনুসন্ধান করলো।

কিছুটা অগ্রসর হতেই একটা সুড়ঙ্গমুখ বেরিয়ে এলো। বনহুর সেই সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো।

ইরানীও প্রবেশ করতে বাধ্য হলো।

সুড়ঙ্গমধ্যে ঝাপসা অন্ধকার হওয়ায় বনহুর একটি মোমবাতি হাতে নিয়ে এগুলো।

অদ্ভুত সে সুড়ঙ্গপথ।

ইরানী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে, নির্জন বাংলোর অভ্যন্তরে এমন একটি সুড়ঙ্গপথ আছে, সে ভাবতেও পারেনি। খানিকক্ষণ চলার পর একটা কক্ষের মধ্যে তারা প্রবেশ করলো। কক্ষটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। একপাশে মোমদানিতে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। একদিকে খাট, খাটে সুন্দর ধবধবে বিছানা পাতা। খাটের পাশেই একটা বইয়ের সেল্‌ফ, তাতে অনেকগুলো বই সুন্দরভাবে সাজানো। ওদিকে একটা ড্রেসিং টেবিল, টেবিলে প্রসাধনী সামগ্রী থরে থরে সাজানো। টেবিলের মাঝখানে একটি ফুলদানি, কিন্তু ফুলদানিটি শূন্য, তাতে কোনো ফুল শোভা পাচ্ছে না।

ইরানী নির্বাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ভূগর্ভে এমন সুন্দর একটি কক্ষ আছে, কেউ ভাবতে পারবে না।

দেয়ালে কতকগুলো ছবি টাঙ্গানো। ইরানী এই ছবিগুলোর মধ্যে একজনকে চিনতে পারলো— সে হলো দস্যু বনহুর।

পাশের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে ইরানী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো— এটা কার ছবি?

বনহুর একটু হেসে বললো— আমার বাপুর।

ছবিখানা দস্যু কালু খাঁর। বিশাল বপু, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল, বিরাট একজোড়া গোঁফ, বড় বড় দুটো চোখ, চোখে তীব্র চাউনি। ছবিখানা যেন একটা জীবন্ত মানুষ।

বনহুর ইরানীকে অবাক হয়ে ছবিখানা লক্ষ্য করতে দেখে বললো—আমার বাপু আমার মতই, তাই না?

উঁহুঁ। তোমার বাপু ঠিক তোমার উল্টো।

তার মানে?

মানে তোমার চেহারাটা তোমার বাপুর ঠিক বিপরীত।

যেমন তোমার বাপুর পাশে তুমি, তাই না?

ইরানী মাথা নিচু করলো।

বনহুর বললো— তুমি এই কক্ষে বিশ্রাম করো।

চোখ তুলে তাকালো ইরানী।

বনহুর পুনরায় বললো— কাজ শেষ করে আবার ফিরে আসবো। মুক্তি দেবো তোমাকে।

কথাগুলো বলে বনহুর সুড়ঙ্গপথে বেরিয়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর ফিরে এলো মধ্যকার কক্ষে।

কক্ষমধ্যে প্রতীক্ষা করছিলো বনহুরের কয়েকজন অনুচর, সর্দারকে দেখামাত্র কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর বললো— মিঃ জাফরীকে পৌঁছে দিয়েছো?

একজন বললো—হাঁ সর্দার।

কোথায় তাকে পৌঁছে দিলে?

সর্দার, আপনি যেভাবে আদেশ করেছিলেন।

তাঁর বাসায় পৌঁছে দিয়েছো?

হাঁ সর্দার।

তখন কি তাঁর জ্ঞান ফিরে এসেছিলো?

না, সর্দার, মিঃ জাফরীর জ্ঞান এখনও ফিরে আসেনি। তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসবে।

অন্যান্য খবর কি?

মনসুর ডাকু আর গোমেশকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বললো মঙ্গলা নামক এক অনুচর।

বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো— মনসুর ডাকু এবং তার সহচর গোমেশ গ্রেপ্তার হয়েছে?

হাঁ, সর্দার।

রহমানের সংবাদ?

উনি আস্তানায় ফিরে গেছেন।

পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণের উৎসব তাহলে বিফলে যায়নি। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও তারা এক প্রখ্যাত ডাকুকে গ্রেপ্তার করেছে, কি বলো?

হাঁ।

তাজ এসেছে?

হাঁ, তাজ এসেছে সর্দার। বললো মাহমুদ নামক আর এক অনুচর।

বনহুর বললো— তোমরা ঠিকমত কাজ করে যেও।

কথাটা বলে বনহুর সিঁড়ির ধাপে পা রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িটা উঠে গেলো উপরে।

পূর্বের সেই নির্জন বাংলোর মধ্যে পৌছে গেলো বনহুর। এবার সে ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ড্রেস পাল্টে নিজের দস্যু-ড্রেস পরে নিলো। তারপর বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতেই তাজ এগিয়ে এলো, প্রভুকে সে অন্ধকারেও চিনেতে পারলো। আনন্দসূচক শব্দ করলো তাজ— চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ... ...

বনহুর তাজের পাশে এসে পিঠ চাপড়ে আদর করলো। তারপর চেপে বসলো তার পিঠে।

তাজ ছুটতে শুরু করলো।

নিস্তব্ধ-নির্জন পথে তাজের খুরের শব্দ অদ্ভুত এক আওয়াজের সৃষ্টি করে চললো। পথের দু'পাশে ঘন জঙ্গল না হলেও বেশ ঝোপঝাড় আর আগাছা রয়েছে। মাঝে মাঝে অশ্বত্থ আর দেবদারু গাছ প্রবীণ প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পথের আশেপাশে তেমন কোনো বাড়িঘর বা দালান-কোঠা নেই। যদিও মাঝে-মধ্যে কোথাও দু'একটা বাড়ির চিহ্ন দেখা যায় সেও পোড়োবাড়ি। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। বাড়িগুলোর ইট খসে পড়েছে, ছাদ ধসে গেছে। বাড়িঘরগুলোর মেঝেতে আগাছা জন্মেছে। এককালে এসব বাড়িঘরে সম্ভ্রান্ত পরিবার বসবাস করতেন। আজ কালের

অতলে তলিয়ে গেছে তাদের সব অস্তিত্ব। শুধু অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইট-চুন-বালি খসে পড়া জীর্ণ দেয়ালগুলো।

বনহুরের অশ্ব পদশব্দে এইসব জীর্ণ বাড়িগুলোর দেয়ালে প্রতিধ্বনি জাগছে। তারই আওয়াজ সৃষ্টি করছে একটা অদ্ভুত সুর।

অশ্বপৃষ্ঠে জমকালো পোশাক পরা দস্যু বনহুর এসে নামলো তার কান্দাই শহরের ঘাটিতে। রাত তখন শেষ প্রহর। বনহুর আস্তানার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে। এ কক্ষটা ঠিক কোনো অফিস কক্ষ বলে মনে হয়। কক্ষের চারপাশে চারখানা বড় বড় আলমারী সাজানো রয়েছে। মাঝখানে সেক্রেটারীয়েট টেবিল। টেবিলে স্তূপাকার কাগজ-খাতাপত্র।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই টেবিলের চারপাশে বসে বিশ্রামরত অনুচরগণ উঠে কুর্নিশ জানালো। বনহুর টেবিলের মাঝখানে একটি চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রয়ার উঠে এলো উপরে। ড্রয়ারের মধ্যে একটা চাবি ছিলো, বনহুর চাবিটা নিয়ে এগিয়ে গেলো ওদিকে বড় একটা আলমারীর কাছে। আলমারীর দরজা খুলতেই একটা সিঁড়ির মুখ দেখা গেলো। বনহুর ভিতরে প্রবেশ করতেই আলমারীর দরজা বন্ধ হলো।

বনহুর ওপাশের সিঁড়ি বেয়ে তার গোপনকক্ষে চলে গেলো। ওয়্যারলেস খুলে ধরলো, রহমানের সঙ্গে কিছু আলোচনা করে নিলো। হয়তো পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণে উৎসব সম্বন্ধে জেনে নিলো সব কথা। তারপর সে আস্তানার অভ্যন্তরে ভূগর্ভ-কক্ষে নেমে এলো।

বিরাট দরবারকক্ষ এটা।

কোনো আসবাবের বালাই নেই। শুধু কয়েকখানা লোহার চেয়ার। একপাশে একটা সুউচ্চ আসন, ঠিক মঞ্চের মত। এই মঞ্চে দঁড়িয়ে বনহুর তার অনুচরদের কাজের নির্দেশ দেয়।

একপাশে একটি লোহার দরজা, সেই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, সুসজ্জিত একটি কক্ষ। এই কক্ষটি সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন আসবাবে পূর্ণ। এটাই বনহুরের শহরের আস্তানায় তার বিশ্রামকক্ষ।

পাশেই একটা কক্ষে থাকে মাহমুদা, যাকে বনহুর একদিন অসহায়া-অনাথা বলে আশ্রয় দিয়েছিলো তার আস্তানায়। ভেবেছিলো, পরে সুযোগমত তাকে তার কোনো আত্মীয়ের কাছে পৌছে দেবে। কিন্তু মাহমুদা আর যেতে চায়নি। আর যাবেই বা সে কোথায়, তার একমাত্র পিতা ছাড়া আর কেউ ছিলো না। পিতাকে হারিয়ে অসহায়া মাহমুদা অকুল সাগরে ভাসছিলো।

বনহুর মাহমুদাকে বোনের দৃষ্টি নিয়ে দেখতো, ওকে স্নেহ করতো সে অপরিসীম। কিন্তু মাহমুদা নিজের অজ্ঞাতে কখন ভালবেসে ফেলেছিলো বনহুরকে।

মাহমুদা তার নিজের পূর্বনাম পাল্টে মাহমুদা রেখেছিলো। সে ভাবতো, তার নামটাই হয়তো অপেয়া, তাই এই বয়সে বাবা মা-আত্মীয়স্বজন সবাইকে হারিয়েছে। বনহুর কথাটা শুনে হেসো বলেছিলো—বেশ, তোমার যদি এ নাম ভাল লাগে, তাই বলে ডাকবো।

কাজেই বনহুর ওকে এই নামেই ডাকতো।

এখানো মাহমুদার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য সব রকম ব্যবস্থা ছিলো। মাহমুদার কাছে থাকার জন্য এক বিশ্বাসী বৃদ্ধাকে রেখে দিয়েছিলো সে।

আজ বনহুরের আগমনে মাহমুদা খুশিতে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলো।

বনহুর হেসে বললো—কেমন আছো মাহমুদা?

ভাল না।

কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?

না।

তবে কি হলো?

এতদিন পর আসো, আমার বড্ড খারাপ লাগে।

জানোতো, আমি সব সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকি?

জানি, তবু তোমার পথ চেয়ে থাকি।

মাহমুদা, এমনি করে কতদিন তুমি আমার পথ চেয়ে থাকবে? বোন, তুমি সভ্য সমাজে ফিরে যাও, আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করে দেবো। তোমার বিয়েতে বহু অর্থ ব্যয় করবো, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। বাড়ি-গাড়ি ঐশ্বর্য সব পাবে মাহমুদা।

বনহুরের মুখে 'বোন' সম্বোধন মাহমুদাকে এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে দীপ্তময় করে তুললো, সে কোনো কথা বলতে পারলো না।

রাত ভোর হবার পূর্বে বনহুরকে কান্দাই জঙ্গলে তার আস্তানায় ফিরে যেতে হবে। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, মাহমুদাকে লক্ষ্য করে বললো—আবার শীঘ্র আসবো বোন। এতদিন তোমার কথা ঠিকভাবে খেয়াল না করে আমি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করো বোন।

মাহমুদা মাথা নত করে রইলো,তার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

বনহুর চিবুকটা তুলে ধরলো মাহমুদার, বললো—একি,তোমার চোখে পানি কেন? তুমি কাঁদছো!

না। কই, কাঁদিনি তো! মাহমুদা তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে নিলো আঁচলে।

বনহুর একটু হেসে বললো—হাঁ, কেঁদো না যেন কোনো সময়।

বনহুর বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

মাহমুদা বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো, কতদিন না সে এই মানুষটিকে দেখেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে এতটুকু বিচলিত বা চঞ্চল হতে দেখেনি, দেখেনি তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন। তার মত সুন্দরী যুবতীকে কতদিন নির্জনে পেয়েও বনহুর কোনোদিন তাকে জানায়নি কোনো প্রেম নিবেদন। বরং মাহমুদা তার মধ্যে দেখতে পেয়েছে এক স্বর্গীয় দীপ্তিভাব। শ্রদ্ধায় নত হয়ে এসেছে তখন মাহমুদার মাথাটা। আজ কত কথা মনে পড়েছে তার, কত স্মৃতিভরা দিন ভেসে উঠছে তার মনের পাতায়।

আসলে মাহমুদা উচ্ছৃঙ্খল, চঞ্চল বা মন্দ মেয়ে ছিলো না, সে ধীর স্থির-বুদ্ধিমতী মেয়ে। বনহুরের দয়ায় সে আজ এখানে আশ্রয় পেয়েছে, এমনি বেঁচে থাকার প্রেরণাও পেয়েছে। একদিন তার সব ছিলো, আজ তার কিছু নেই। এখানে যদি সে আশ্রয় না পেতো তাহলো হয়তো কোথায় ভেসে যেতো তৃণকুটার মত কে জানে।

মাহমুদা খান্দানী বংশের মেয়ে, তাঁর চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। সুদীর্ঘ দেহ, সুন্দর দুটি চোখ, দীর্ঘ কৃষ্ণ কালো একরাশ ঘন চুল। যে কোনো পুরুষের কামনার বস্তু মাহমুদা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু বনহুরের মনে মাহমুদার এ অপরূপ সৌন্দর্য কোনোদিন আলোড়ন জাগায়নি। কতদিন ঘনিষ্ঠ হয়ে কত আলাপ-আলোচনা চলেছে তাদের মধ্যে—বনহুরের সান্নিধ্য- মাহমুদার দেহ-মনে শিহরণ জাগিয়েছে তবু সে ওর মধ্যে খুঁজে পায়নি কোনো পরিবর্তন।

কতদিন কত কথা বনহুরকে নিয়ে সে ভেবেছে- অভিমান হয়েছে এবার এলে সে তার সঙ্গে কোনো কথাই বলবে না। কিন্তু ও এলে পারেনি

মাহমুদা নিশ্চুপ থাকতে। ছুটে এসেছে তার পাশে। ওর হাস্যোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল তাকে মুখরা করে তুলেছে।

আজ মাহমুদা বুঝতে পারে, এতদিন সে ভুল করেছে। যাকে সে প্রাণ দিয়ে কামনা করেছে তাকে সে কোনোদিন পাবে না। মাহমুদার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

❑

বনহুরকে নিয়ে পুলিশ মহলে আবার নতুন করে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণের উৎসব থেকে বনহুর মনসুর ডাকুর কন্যাকে নিয়ে উধাও হয়েছে। যাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এত আয়োজন, তাকে গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, কেউ চিনতেও পারলো না, বরং মার্কিন গোয়েন্দা মিঃ লাউলং এর পাশে বসে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করে গেলো।

মিঃ আরিফ চৌধুরী মিঃ লাউলং, মিঃ হাসান এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার সর্বক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেমন করে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যায়। সবচেয়ে বেশি রাগ মিঃ জাফরীর কারণ তাঁকে কৌশলে বনহুর বন্দী করে রেখে নিজে উৎসবে যোগ দিবার সুযোগ করে নিয়েছিলো।

পুলিশ অফিসে আজ সন্ধ্যায় এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে মিঃ জাফরী বলবেন কেমন করে তাঁকে বনহুর আটক করেছিলো।

মিঃ লাউলং এবং আরও অনেক বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার থাকবেন এই বৈঠকে। সকলের মনেই মিঃ জাফরীর ঘটনা জানার বাসনা প্রবলভাবে দানা বেঁধে আছে। সন্ধ্যার পূর্বেই পুলিশ অফিসের সামনে মোটরকারের ভীড় জমে উঠলো।

একসময় সবাই জড়ো হলেন। পুলিশ অফিসের ভিতরে বৈঠক বসলো। মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য অফিসার গোলাকার হয়ে বসেছেন। সকলের উদ্বিগ্নভরা দৃষ্টি মিঃ জাফরীর মুখে।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল গম্ভীর, কেমন যেন একটা অপমানিত ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর চোখেমুখে।

মিঃ আরিফ বললেন—দিন দিন দস্যু বনহুরের স্পর্ধা চরমে উঠছে। যেভাবে হোক তাকে শায়েস্তা না করলেই নয়।

কিন্তু কিভাবে তাকে শায়েস্তা করবেন বলুন? পুলিশ মহল তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। কথাটা বললেন ইন্সপেক্টার মিঃ ইয়াসিন।

মিঃ হাসান বললেন—তার জীবন্ত প্রমাণ হলেন আমাদের মিঃ জাফরী। তিনি দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে আজ নয়, কয়েক বছর ধরে অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে।

হাঁ, আমার চেষ্টার কোথাও ভুল নেই। এত নিপুণতার সঙ্গে কাজ করেও আমি দস্যু বনহুরকে শায়েস্তা করতে পারলাম না। সমস্ত আয়োজন আমার ব্যর্থ হয়েছে বারবার।

মিঃ আরিফ বললেন—দস্যু বনহুর কি করে সেদিন আপনাকে এমনভাবে আটক করলো, সেটাই আমরা আজ পর্যন্ত ভেবে পাচ্ছি না।

সে অতি আশ্চর্য ব্যাপার মিঃ চৌধুরী। পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণে উৎসবে আসবো বলে দ্রুত অফিসের কাজ সেরে নিচ্ছিলাম, এমন সময় আমার পুরোন ভৃত্য এসে আমাকে জানালো, বাসার ভিতরে ডাকছেন। আমি তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গুছিয়ে ভিতরে চলে গেলাম। দেখলাম, আমার স্ত্রী এক গেলাস গরম দুধ হাতে দাঁড়িয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, আজ বিকেলে দুধ খাওনি, এখন খেয়ে নাও। আমার আপত্তি জানাবার সময় ছিলো না, স্ত্রীর হাত থেকে দুধের গেলাসটা নিয়ে ঢকঢক করে পান করলাম, তারপর নেমে এলাম নিচে। গাড়ি-বারান্দায় আমার গাড়ি অপেক্ষা করছিলো; আমি সোজা গাড়ির পিছন আসনে চেপে বসলাম। ড্রাইভার জানতো, আমি পুলিশ অফিসের উৎসবে যোগ দেবার জন্যই এ সময় বাড়ি থেকে বের হচ্ছি। কাজেই ড্রাইভারকে আমি কিছু না বলে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে নীরবে পান করে চললাম। গাড়ি চলতে শুরু করলো, তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ জাফরী। এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলেন পুলিশ অফিসারগণ, কারও মুখে কোনো উক্তি উচ্চারিত হচ্ছিলো না। সবার চোখেমুখেই বিস্ময়।

মিঃ আরিফ বললেন—নিশ্চয়ই দুধের সঙ্গে কোনো---

মিঃ হাসান বললেন—স্যার, তা কেমন করে সম্ভব হয়। দুধতো অন্য কেউ দেয়নি, দিয়েছেন মিসেস জাফরী।

এখানেই তো আশ্চর্য হবার কথা। বললেন মিঃ লাউলং।

এখানে সব আলাপ আলোচনা ইংরেজিতেই হচ্ছিলো, কাজেই মিঃ লাউলং-এর বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। তিনি আরও বললেন—দুধের সঙ্গেই যে কোনো ওষুধ মেশানো ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ জাফরী গম্ভীরভাবে মাথা দোলালেন—হাঁ, আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু----

মিঃ লাউলং আবার বললেন—কিছুই আশ্চর্য নয় মিঃ জাফরী, আপনার স্ত্রী দুধের গেলাস আপনাকে এনে দেবার পূর্বে দুধে কেউ ওষুধ মিশিয়ে রেখেছিলো, এমনও তো হতে পারে।

ঠিক, আপনার বাবুর্চির মধ্যে শয়তানি থাকতে পারে। বললেন মিঃ আরিফ।

মিঃ জাফরী বললেন—বাড়ির বাবুর্চি কেন, পুরোন ভৃত্য থেকে দারোয়ান পর্যন্ত সবাইকে আমি আটক করে রেখেছি। সবাইকে শাস্তি দিয়েছি, কিন্তু কাউকে স্বীকার করাতে পারিনি।

মিঃ লাউলং বললেন—হুঁ, দস্যু বনহুর দেখছি মহা চাল চেলেছে। আচ্ছা, আমি নিজে একবার ওদের জেরা করে দেখবো। মিঃ জাফরী, তারপর কি হলো বলুন?

মিঃ জাফরীর মুখোভাব অত্যন্ত ম্লান, নিষ্প্রভ মনে হচ্ছিলো। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন—যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, দেখলাম আমার অফিস কক্ষের একটা চেয়ারে বসে আছি।

পুলিশ অফিসারগণ সবাই বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন।

মিঃ হাসান বললেন—কি আশ্চর্য ব্যাপার।

হাঁ, আশ্চর্য বটে। বললেন মিঃ লাউলং।

মিঃ আরিফ চৌধুরী বললেন—তারপর কি দেখলেন?

মিঃ জাফরী গম্ভীর গলায় বললেন—প্রথমে আমি কিছু চিন্তা করতে পারলাম না। মনে হলো মাথাটা বড় ঝিম ঝিম করছে যখন স্বাভাবিক হলাম তখন সব কথা মনে পড়লো---পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণে উৎসবে যোগ দিবার জন্য আমি আমার গাড়িতে যাচ্ছিলাম--কিন্তু কেমন করে আবার আমার অফিস-রুমে এলাম, কিছুই ভেবে পেলাম না।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলেন মিঃ ইয়াসিন। তিনি প্রবীণ পুলিশ অফিসার, এবার তিনি বললেন—দস্যু বনহুরকে নিয়ে আমরা যতই চিন্তা-ভাবনা করি না কেন, তার অদ্ভুত কার্যকলাপ আমাদের আরও অবাক করবে। তাকে আরও রহস্যময় বলে মনে হবে।

ঠিকই বলেছেন মিঃ ইয়াসিন, জীবনে বহু চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ দস্যু-ডাকু দেখেছি এবং গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু এমন বিস্ময়কর দস্যু আমি দেখিনি। কথাগুলো স্থিরকণ্ঠে বললেন মিঃ আরিফ।

মিঃ লাউলং ভাবছিলেন, তিনি বিশ্বের প্রখ্যাত গোয়েন্দা, আর কিনা তাঁর চোখে ধূলো দিয়ে দস্যু বনহুর এতগুলো কাজ করে গেলো অথচ তাকে গ্রেপ্তার করতে তিনি সক্ষম হলেন না। এ আফসোস তাঁকে ভীষণভাবে ম্লান করে দিয়েছে তিনি নিজ মনে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছিলেন, মুখমণ্ডল রাঙ্গা হয়ে উঠেছে তাঁর। মাঝে মাঝে অধর দংশন করছিলেন তিনি।

এখানে যখন দস্যু বনহুরকে নিয়ে নানা রকম জল্পনা কল্পনা চলেছে তখন দস্যু বনহুর তার আস্তানায় বিশ্রামকক্ষে বিশ্রাম করছিলো। হঠাৎ তাঁর কানে ভেসে আসে নূরীর গানের সুর। নূরীর কণ্ঠ বনহুরকে চঞ্চল করে তোলে, শয্যা ত্যাগ করে সে উঠে দাঁড়ায়।

নূরীর কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ায় বনহুর।

শিশু জাভেদকে দোলনায় শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলো নূরী, ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে গেয়ে দোলনায় দোল দিচ্ছিলো। মাঝে মাঝে চুমু দিচ্ছিলো জাভেদের ছোট্ট লাল টুকটুকে ঠোঁটে। মায়ের চুমুতে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে উঠছিলো জাভেদ।

ঘুমানোর পরিবর্তে জাভেদকে হাসতে দেখে নূরী ক্রুদ্ধ হবার ভান করে কোমল হস্তে মৃদু চড় দেয়।

বনহুর এতক্ষণ চুপ করে মা ও ছেলের তামাশা দেখছিলো, এবার সে পিছন থেকে নূরীর চোখ দুটো ধরে ফেলে। নূরীর গান থেমে যায়, কিছুমাত্র অবাক না হয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, স্বামীর হাত দু'খানা সরিয়ে দিয়ে বললো—যাও, লজ্জা করে না? দেখছো না জাভেদ কেমন তাকিয়ে আছে?

ও, তাই তো, বড্ড ভুল হয়েছে। বনহুর নূরীকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যায় জাভেদের দোলনার পাশে। জাভেদ তখন হাত পা নেড়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছিলো।

বনহুর জাভেদকে তুলে নিলো হাতের উপর শিস্ দিয়ে আর করতে লাগলো সে ওকে। একসময় হাতের তালুতে দাঁড় করিয়ে উচু করে ধরতেই নূরী ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলো—আরে পড়ে যাবে যে?

এত সহজ নয় নূরী, তোমার জাভেদ দেখ কত শক্ত হয়েছে।

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তোমার শক্ত হাতের ছোঁয়ায় ওর নরম দেহটা আজকেই শক্ত হয়ে গেলো।

ভবিষ্যতের দস্যু জাভেদকে তার পিতার হাতের পরশে গড়ে উঠতে দাও নূরী, অমন নরম হতে দিও না।

বনহুরের কোল থেকে নূরী জাভেদকে কোলে নেয়, তারপর জাভেদের নরম তুলতুলে গণ্ডে ছোট্ট একটি চুমু দিয়ে বলে—এবার ঘুমাও কেমন? দোলনায় শুইয়ে দেয় নূরী জাভেদকে।

বনহুর বলে—গান গাও নইলে জাভেদ ঘুমাবে না।

না, আর গাইবো না। তুমি চোরের মত চুপি চুপি শুনছিলে কেন, বলো?

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়, বলে—থাক, আর বলতে হবেনা। এবার যাও দেখি।

উঁ হুঁ, যাবো না। বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে।

নূরী বলে উঠে—ছিঃ ছিঃ দেখছো না জাভেদ রয়েছে?

বনহুর দোলনার দিকে উঁকি দিয়ে দেখে বলে—ঐ দেখো ঘুমিয়ে পড়েছে।

নূরী তাকিয়ে দেখলো, সত্যি জাভেদ মুখের মধ্যে বুড়ো আঙ্গুলটা রেখে চুষতে চুষতে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছে।

বনহুর নূরীর হাত ধরে তার বিশ্রামকক্ষের দিকে নিয়ে চললো। নিজ কক্ষে প্রবেশ করে নূরীকে শয্যায় বসিয়ে দিলে ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো—এবার আমাকে ঘুম পাড়াও।

তুমি বুঝি কচি খোকা হয়েছো?

কেন, আমি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছি বুঝি? গান গাও, সেই ঘুমপাড়ানি গানটা।

বেশ গাইছি, যদি না ঘুমাও তবে কিন্তু শাস্তি দেবো।

আচ্ছা, আচ্ছা দিও। বনহুর মিছামিছি চোখ মুদলো।

এমন সময় ভেসে এলো বাইরে থেকে রহমানের গলা—সর্দার!

বনহুর নূরীর কোল থেকে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বললো—রহমান ডাকছে, হয়তো কোনো জরুরি কথা আছে। ঘুমানো আর হলো না নূরী।

নূরীর মনটা ভার হয়ে এলো, কোনো কথা বললো না সে।

বনহুর বেরিয়ে আসতেই রহমান কুর্ণিশ জানালো। তারপর বললো—সর্দার, একটা সংবাদ আছে।

· চলো, দরবারকক্ষে চলো, ওখানেই সব শুনবো।

বনহুর আর রহমান দরবারকক্ষে প্রবেশ করতেই বনহুরের অনুচরগণ তাকে কুর্ণিশ জানালো। সশস্ত্র অনুচরদল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলো।

বনহুর আর রহমান এগিয়ে গেলো আসনের দিকে।

রহমান একপাশে সরে দাঁড়ালো।

সর্দার আসন গ্রহণ করতেই কায়েসের ইঙ্গিতে এগিয়ে এলো হাশমত। কুর্ণিশ জানালো সে রাইফেল হাতে মিলিটারী কায়দায়। এককালে হাশমত মিলিটারীতে কাজ করতো বলে তার চালচলনে মিলিটারী কায়দা এখনও পরিলক্ষিত হয়। হাশমত বনহুরের কান্দাই শহরের ঘাঁটিতে থাকে এবং তার কাজ সর্বক্ষণ শহরের মধ্যে অনুসন্ধান চালানো—কোথায় কে বা কারা কিভাবে মানুষের সর্বনাশ করছে।

হাশমত কুর্ণিশ জানাতেই বনহুর বললো—কি সংবাদ হাশমত?

হাশমত বললো—সর্দার, একটা ভয়ঙ্কর সংবাদ, যা কান্দাই এর দশ কোটি মানুষকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে চলেছে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো বনহুর—কি এমন সংবাদ, বলো?

হাশমত বলতে শুরু করলো—সর্দার, কান্দাই-এ এক দুষ্কৃতি ব্যবসায়ীদল নতুন এক ব্যবসা শুরু করেছে। তারা নাপাম বোমার বিষাক্ত গ্যাস মিশিয়ে সরিষার তেল তৈরি করছে। যে তৈল দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না তেলে কোনো ভেজাল আছে। খাঁটি সরিষার তেলের মত রং-গন্ধ সবকিছু কিন্তু সেগুলো যে অতি ভয়ঙ্কর মারাত্মক বিষাক্ত তেল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সর্দার, এই পত্রিকাখানা পড়লে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

হাশমত কাপড়ের তলা হতে একটা পত্রিকা বের করে এগিয়ে ধরলো বনহুরের দিকে।

বনহুর পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে রহমানকে দিয়ে বললো—পড়ো। রহমান পত্রিকাখানা মেলে পড়তে শুরু করলো—

"সরিষার তেলে নাপাম বোমার বিষাক্ত গ্যাস মিশাইয়া অসাধু ব্যবসায়ীরা দেশবাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে"

ডাইক্লোরথিল সালফাইড্ অর্থাৎ সাধারণভাবে পরিচিত মাষ্টার্ড গ্যাস-এর সাহায্যে কৃত্রিম সরিষার তেল উৎপাদন করিয়া একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সুপরিকল্পিতভাবে সরিষার তেল ব্যবহারকারী কান্দাই-এর দশ কোটি মানুষকে তিলে তিলে দুরারোগ্য ক্যান্সারের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ মহলসূত্রে জানা গিয়াছে, বাজারে সরবরাহকৃত শতকরা একশত ভাগ সরিষার তেলই বিষাক্ত নাপাম বোমার উপরোক্ত উপকরণে দূষিত। প্রায় এক বৎসর পূর্বে কান্দাই এ-র কোন এক পল্লীতে অনুরূপ অসৎ কার্যের সূত্র পাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দেশের শতকরা একশত ভাগ মানুষের এই ভোজ্য দ্রব্যটির বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার কোন পরীক্ষা, তথ্য বা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। উপরন্তু এই অসাধু ব্যবসায়ে লিপ্ত কান্দাই-এ ধৃত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, জনসাধারণকে তাহাও জানান হয় নাই।

বিশেষজ্ঞ মহলসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ডিক্লোরোথিল সালফাইড মিশ্রিত কথিত সরিযার তৈলে প্রকৃত সরিষার তৈলের ভাগ একেবারেই নাই।

জানা গিয়াছে যে সাদা প্যারাফিনের সহিত উক্ত বিষাক্ত গ্যাস ও রং মিশ্রিত করিয়া আজ দীর্ঘদিন যাবৎ বাজারে সরিষার তৈল হিসাবে বিক্রয় করা হইতেছে। উক্ত বিষাক্ত কৃত্রিম সরিষার তৈল খাইয়া দেশের বিপুল সংখ্যক নরনারী তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এতক্ষণ বনহুর স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলো, বলে উঠলো সে থাক, আর পড়তে হবে না।

রহমান ক্ষান্ত হলো, কাগজখানা ভাঁজ করে রাখলো হাতের মুঠায়।

রহমান বললো—সর্দার, এইসব ব্যবসায়ী শুধু দেশের শত্রু নয় দেশের জনগণের মরণ ছোবল।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো আসন ত্যাগ করে, তারপর বললো—বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে এই বিষধর সাপগুলোর। রহমান, তুমি আজই হাশমতের সঙ্গে গিয়ে নিজে এসব দুষ্কৃতি ব্যবসায়ীর সঠিক ঠিকানা জেনে এসো।

আচ্ছা সর্দার।

এবার পুলিশের হেফাযতে নয়, আমি নিজে এদের শায়েস্তা করবো।

রহমান বললো—পুলিশ মহল আজ পর্যন্ত এর কোনো কিছুই করতে সক্ষম হয়নি।

পুলিশ মহলের গাফলতিই এইসব শয়তান দুস্কৃতি ব্যবসায়ীকে এতদূর অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে। বললো কায়েস।

হাশমত বলে উঠলো—পুলিশ মহল যদি সত্যিকারের নজর দিতো তাহলে এমনভাবে দেশ অধঃপতনের দিকে যেতো না। এইসব দুষ্কৃতি ব্যবসায়ী মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে পুলিশ মহলকে বোবা বানিয়ে রেখেছে। তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। জনগণ এ ব্যাপার নিয়ে হাজার মাথা ঠোকাঠুকি করেও কিছু ফল পায়নি।

এবার বললো বনহুর—পুলিশ মহলের মুখ বন্ধ করে যারা দেশ বাসীর সর্বনাশ করে চলেছে, আমি এবার তাদের মুখ বন্ধ করে দেবো চিরতরে। দাঁতে দাঁত পিষলো সে, তার দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হলো। একটু থেমে বললো আবার বনহুর—শুধু এই সরিষার তেলে ভেজালকারী নয়, আমি দেশের সর্বনাশক ভেজাল কারীদের সমুচিত শাস্তি দেবো। যারা খাদ্যদব্যে নানারূপ বিষাক্ত ভেজাল মিশিয়ে আজ কোটি কোটি টাকার মালিক বনে বসে আছে, আমি শুষে নেবো এসব ব্যবসায়ীর বুকের রক্ত।

রহমান বললো—সর্দার, আজকাল প্রতিটি খাদ্যের সঙ্গেই ভেজাল মেশানো হচ্ছে। চাউলে পাথর, আটার মধ্যে তেঁতুল বীজের গুড়া, তুলাবীজের গুড়া। চিনির সঙ্গে আটা-ময়দা, দুধের সঙ্গে পাউডার দুধ, ঘির সঙ্গে ডালডা এমন কোনো খাদ্য নেই যা ভেজাল বিহীন পাওয়া যায়।

শুধু স্বাভাবিক ভেজাল হলে তবু হতো রহমান। দেশের মানুষ সব অর্থের লোভে জানোয়ার বনে গেছে। জানোয়ার বললেও ভুল বলা হয়, কারণ জানোয়াররা এমন সর্বনাশ করতে পারবেনা, যেমন করছে আজকের মানুষগণ। এইসব ধনকুবেরু ব্যবসায়ী পশুর অধম, ঘৃণ্য জানোয়ার কুকুরের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়। মানুষনামী জীব এরা সব বুঝে, জানে-তবু মানুষ হয়ে মানুষের সর্বনাশ করে। কথাগুলো বলে থামলো বনহুর।

রহমান এবং অন্যান্য অনুচর নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলো। তারা সর্দারের কথাগুলো শুনছিলো মনোযোগ সহকারে।

বনহুর আবার বলতে শুরু করলো—এইসব ব্যবসায়ী সুপরিকল্পিতভাবে দেশের জনগণের চরম সর্বনাশ করে চলেছে, তাদের সহায়তা করে চলেছে দেশের কতকগুলো মানুষনামী জানোয়ার, যাদের জন্য দেশের শান্তি চিরতরে সমাধিস্থ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই সব শয়তান দল গোপনে আরও অনেক রকম ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসেছে—ছেলেচুরি ব্যবসা,

নারীহরণ ব্যবসা, এমনি আরও কত জঘন্য ব্যবসা যা মুখে আনাও পাপ। রহমান, এবার আমি এইসব দুষ্কৃতি অসাধু ব্যবসায়ীর শায়েস্তা ব্যাপারে মনোযোগ দেবো। আরও কিছু লোককে আমি শায়েস্তা করবো, দেশের শাসক হয়ে যারা শোষণ করে চলেছে—এই সব ব্যবসায়ীকে যারা প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। মোটা অঙ্ক ঘুষ খেয়ে যারা মোটা বনে গেছে, আমি তাদের রক্ত শোষণ করবো এবার-----------

বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে, চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। বারবার তার হাতখানা কোমরের বেল্টে ছোরার বাঁটে এসে ঠেকছে। অধর দংশন করছে বনহুর।

❑

কান্দাই-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মিল মালিক মওলানা ইয়াকুব আলী মাশহাদী তাঁর মিল পরিদর্শন করে ফিরে এলেন অফিস কক্ষে। একটি নয় কান্দাই শহরে তাঁর কয়েকটি মিল রয়েছে। তাঁর একটি মিলে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি শ্রমিক কাজ করে। মাসিক আয় তাঁর পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি। শুধু কান্দাই শহরে নয়, দেশের বাইরেও তাঁর মিল রয়েছে। এসব মিল থেকে বছরে কোটি কোটি মণ সরিষার তেল দেশ-বিদেশে চালান যায়।

মওলানা ইয়াকুব আলীর মুখে সব সময় আল্লাহ আল্লাহ বুলি। নামাজ পড়ে কপালে দাগ পড়ে গেছে। পাজামা-পাঞ্জাবী শেরওয়ানী, মাথায় টুপি. মুখে একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি। মুখে সর্বক্ষণ আল্লাহর নাম স্মরণ করলেও মনে মনে টাকার অঙ্ক কষেন তিনি সব সময় চোখে সোনার ফ্রেমে আঁটা চশমা, আংগুলে হীরের আংটি—একটি নয়, দশ আংগুলে সাতটি।

লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁর আয় হলেও শ্রমিকদের মজুরি দেবার সময় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হিসাব করে দেবার নিয়ম। কড়া হুকুম আছে তাঁর কর্মচারীদের উপর—একটি পয়সা যেন এদিক-সেদিক না হয়।

অবশ্য কয়েকজন কর্মচারীর বেতন বেশ মোটা অঙ্কের দেন তিনি। কারণ এরাই তাঁর ডান হাত! এদের দ্বারাই চলেছে তাঁর ব্যবসা। মওলানা সাহেব এই সব কর্মচারীকে অত্যন্ত সমীহ করে চলেন। তাঁর কারবার যে [illegible] ভেজালের উপর চলছে, তার প্রধান সহায়ক এরা।

মওলানা সাহেব এবাদত করেন, মুখে জিকির করেন, মাঝে মাঝে হজ্বে [illegible] কিন্তু কোনো অসহায় ব্যক্তি যদি সারাদিনের ক্ষুধাত

হয়ে একটা পয়সা সাহায্য চায়, তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেন বিনা দ্বিধায়।

আজ পর্যন্ত কোনো অসহায় ব্যক্তি তার কাছে এতটুকু দয়া বা সাহায্য পায়নি। দেশের কোনো মঙ্গল সাধনে তিনি একটি পয়সা ব্যয় করেননি কোনোদিন।

এহেন মওলানা ইয়াকুব আলী মাশহাদীই সেই তেল ব্যবসায়ীদের একজন যারা নাপাম বোমার বিষাক্ত গ্যাস মিশিয়ে দেশবাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

মওলানা মাশহাদী অফিস রুমে এসে বসলেন তাঁর অফিসকক্ষ এগারো তলা ছাদের এক বিশিষ্ট জায়গায় অবস্থিত, সহসা কেউ এই কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাঁর সঙ্গে যারা এই ব্যবসায় গভীরভাবে লিপ্ত তারা এবং তাঁর বিশেষ কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া কেউ এখানে আসতে পারে না।

মওলানা মাশহাদী অফিসকক্ষে বসে ফোনের পর ফোন করে চললেন। তাঁর টেবিলে একটি বা দুটি নয় কয়েকটি রিসিভার সাজানো রয়েছে।

মওলানা সাহেব যখন বিভিন্ন স্থানে কারবার নিয়ে কোনো আলাপ করছিলেন, ঠিক সেইমুহূর্তে নিচে ১নং লিফটের মুখে এসে দাঁড়ালেন এক ভদ্রলোক। হাতে এ্যাটাচি ব্যাগ, চোখে গগলস্ মাথায় ক্যাপ, ঠোঁটের ফাঁকে দামী চুরুট।

১নং লিফটে মওলানা মাশাহাদী এবং তাঁর ব্যবসায় জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া এ লিফট অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারতো না।

ভদ্রলোকটি কার্ড বের করে দেখালেন লিফ্‌টম্যানকে।

লিফ্‌ট ম্যান সঙ্গে সঙ্গে লিফ্‌টের দরজা খুলে দিলো।

ভদ্রলোকটি তাঁর হস্তস্থিত চুরুটের শেষ অংশ মেঝেতে ফেলে বুটের গোড়ালি দিয়ে পিষে ফেললেন তারপর লিফটে প্রবেশ করলেন।

এগারো তলায় পৌঁছতেই লিফট থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোকটি মওলানা মাশহাদীর অফিস রুমের দিকে।

অফিস রুমের দরজায় রাইফেলধারী পাহারাদার দাঁড়িয়ে কড়া পাহারা দিচ্ছে।

ভদ্রলোকটি একটা কার্ড বের করে দারোয়ানের হাতে দিলেন।

দারোয়ান কার্ড হাতে চলে গেলো ভিতরে।

ভদ্রলোক শুনতে পাচ্ছেন মওলানা মাশহাদী ফোনে কার সঙ্গে যেন আলাপ করছেন। তাঁর ব্যবসা ব্যাপারে আলাপ চলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দারওয়ান ভিতরে প্রবেশ করে সেলুট দিয়ে কার্ডখানা এগিয়ে ধরলো মওলানা সাহেবের দিকে।

মওলানা মাশহাদী তাঁর মূল্যবান ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসে হাত বাড়ালেন, দক্ষিণ হাতে তার রিসিভার। কার্ডখানা নিয়ে চোখের সামনে ধরেই বললেন—ভিতরে আসতে বলো।

দারওয়ান বেরিয়ে গেলো।

ভদ্রলোক নতুন একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করছিলেন। দারওয়ান জানালো—ভিতরে যান।

ভদ্রলোক চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মওলানা মাশহাদী রিসিভার রেখে সোজা হয়ে বসলেন। ভদ্রলোক তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু কার্ড ছিলো তাঁর বিশিষ্ট এক সহকারীর, চমকে উঠলেন মাশহাদী সাহেব; বললেন—আপনি কে?

কেন কার্ড পাননি? জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

মাশহাদী সাহেব কার্ডখানা আবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন, বললেন তিনি—আপনাকে আমি চিনি না। কার্ডখানায় যার নাম লেখা, সে আমার ব্যবসার সহায়, আমার বন্ধু।

মনে করুন, আমার নাম আর আপনার বন্ধুর নাম এক। আমিওতো আপনার ব্যবসায়ে সহায়তা করতে পারি? যাক, আপনি যখন আমাকে বসতে বলতে সাহসী হলেন না তখন আমি নিজেই আসন গ্রহণ করছি।

মওলানা মাশহাদী অবাক হয়ে গেছেন একেবারে। ভদ্রলোকটির কথাবার্তা কেমন যেন হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। অবাক হয়ে তাকালেন তিনি ভদ্রলোকটির মুখের দিকে।

ভদ্রলোক তাঁর এ্যাটাচি খুলে একটি চুরুট বের করে এগিয়ে ধরলো —পান করুন।

মাশহাদী সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকালেন, চোখেমুখে তাঁর কেমন অবিশ্বাসের ছায়া।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—আমাকে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই। আমি আপনার ব্যবসার সুনাম শুনে এসেছি। আপনার সঙ্গে কারবার চালাবো।

এবার ভদ্রলোকের কথাবার্তায় অনেকখানি স্বচ্ছ হয়ে এলেন মাশহাদী সাহেব। তিনি বললেন—আপনি কোনো কোম্পানি থেকে এসেছেন?

কোনো কোম্পানি আমার নেই তবে প্রচুর অর্থ আছে। অর্থ দিয়ে আমি অর্থ ধরতে চাই। মওলানা সাহেব, আপনার সঙ্গে বায়নাপত্র চুক্তিবদ্ধ হতে চাই। কত টাকা আপনাকে প্রথম দিতে হবে জানতে পারলে আমি টাকা---

টাকার কথায় মওলানা সাহেবের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো বললেন তিনি—টাকার কথা পরে হবে। আপনি যদি ব্যবসা করতে চান তাহলে পাকা কথাবার্তা হয়ে নিক।

বেশ, যা ভাল মনে করেন আমি তাই চাই। তবে হাঁ, টাকা পয়সা আমি সঙ্গেই এনেছি। একলাখ পঞ্চাশ হাজার।

এবার হাসি বের হলো মওলানা সাহেবের মুখে, তিনি লোলুপ দৃষ্টিতে টেবিলে রাখা এ্যাটাচি ব্যাগটার দিকে তাকাতে লাগলেন।

একথা সেকথার ফাঁকে ভদ্রলোকটি চুরুটের বাক্সটা এগিয়ে ধরলেন মাশহাদী সাহেবের দিকে-নিন, ততক্ষণে একটি সেবন করুন।

মাশহাদী সাহেব কথার ফাঁকে অন্যমনস্কভাবে একটা চুরুট তুলে নিয়ে মুখে গুঁজলেন।

ভদ্রলোক নিজ হাতে মওলানার চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন—আলাপ চলতে লাগলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চেয়ারের উপর ঢলে পড়লেন কোটিপতি মওলানা ইয়াকুব আলী মাশহাদী।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ডাকলেন—দারওয়ান, দারওয়ান---

দারওয়ান অফিসকক্ষে প্রবেশ করতেই ভদ্রলোক ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—তোমাদের সাহেব হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন, এঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

দারওয়ান হতভম্বের মত বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

ভদ্রলোক বললেন—তুমি আমাকে সাহায্য করো। আমার গাড়িতেই ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো।

দারওয়ান তার হাতের রাইফেলখানা দেয়ালে ঠেশ দিয়ে রেখে ধরলো।

মওলানা সাহেবের দেহটা ভদ্রলোক এবং দারওয়ান মিলে লিফ্‌টের দরজায় নিয়ে এলো। লিফ্‌ট ম্যানতো অবাক, বললো—সাহেবের কি হয়েছে?

ভদ্রলোক ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। বেশি লোক জানাজানি হলে বিলম্ব হতে পারে, কাজেই শীঘ্র হাসপাতালে নিতে পারলে বাঁচতে পারেন। অবস্থা মোটেই ভাল নয়-----লিফ্‌ট ম্যানও এগিয়ে এলো সাহায্য করতে। বেশি ভাববার সময় কারো ছিলো না, দারওয়ান ও লিফট ম্যানের সাহায্যে ভদ্রলোক মওলানা মাশহাদীর সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিলেন নিজের গাড়িতে।

গাড়িখানা নিচেই অপেক্ষা করছিলো, দু'চারজন কর্মচারী যারা আশেপাশে ছিলো সবাই ছুটে এলো তারাও সাহায্য করলো মালিককে গাড়িতে উঠানোর ব্যাপারে। অবশ্য কেউ ভেবে পাচ্ছে না কি ব্যাপার।

মওলানা মাশহাদীর সংজ্ঞাহীন দেহসহ ভদ্রলোকের গাড়িখানা উল্কাবেগে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কথাটা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে।

ম্যানেজার এবং মাশহাদীর সহকারিগণ ব্যাস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলো। মাশহাদীর অফিসরুমে প্রবেশ করে থ' বনে গেলো। কে সে ভদ্রলোক যিনি তাদের মালিককে হঠাৎ অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ফোন করা হলো, কিন্তু আশ্চর্য হাসপাতালে মওলানা মাশহাদী এবং তার বিশিষ্ট বন্ধুর পাত্তা নেই। লোক ছুটলো চারিদ্দিকে। কোথায় গেলো সেই সবুজ রংয়ের গাড়িখানা?

পুলিশ অফিসে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ অফিসার মিঃ হুদা কয়েকজন পুলিশসহ হাজির হলেন। মিঃ হুদা কান্দাই থানা অফিসার। যেমন চেহারা তেমনি তার ব্যবহার। দু'আনা পয়সা পেলে ও পকেটে ফেলা তার অভ্যাস।

মওলানা মাশহাদী সাহেবের সঙ্গে মিঃ হুদার যোগাযোগ ছিলো অত্যন্ত বেশি। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হলেন বিশাল বপু নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে।

প্রথমেই অফিস রুমের দারওয়ান এবং লিফট ম্যানকে গ্রেপ্তার করলেন মিঃ হুদা। তারপর জেরা শুরু করলেন রীতিমত।

মিঃ হুদা দারওয়ান এবং লিফটম্যানকে হাজতে পাঠালেন কিন্তু আসল রহস্য উদ্ঘাটন হলো না কিছু। সমস্ত অফিসে এক মহা হুলস্থুল পড়ে গেলো।

ম্যানেজার ও মওলানার সহকারিগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সঙ্গে ছুটাছুটি করতে লাগলো। কেউ কেউ ছুটলো গাড়ি নিয়ে কান্দাই-এর বিভিন্ন হাসপাতালে।

কেউ বললেন—কান্দাই পুলিশ অফিসে ফোন করা হোক পুলিশ সুপার মিঃ আরিফ চৌধুরীর কাছে।

কিন্তু মিঃ হুদা এতে প্রথমে মত দিছিলেন না, পরে বাধ্য হয়ে বললেন—হাঁ, এতক্ষণ আমাদের ভুল হয়েছে, শীগ্‌গীর পুলিশ সুপারের কাছে জানানো দরকার।

পুলিশ, অফিসে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আরিফ চৌধুরী মিঃ হাসানসহ চলে এলেন। একটা বিস্ময়কর ঘটনা এটা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ আরিফ এসে মিঃ হুদাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি কোনো ক্লু পেয়েছেন?

মিঃ হুদা জানালেন—স্যার, আমি অফিস রুমের দারওয়ান এবং লিফটম্যানকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠিয়েছি, কারণ এদের দু'জনের সহায়তায় দুষ্কৃতিকারী মহান ব্যাক্তি মওলানা সাহেবকে নিয়ে উধাও হতে পেরেছে।

মিঃ আরিফ নিজে পুনরায় অফিসকক্ষ পরীক্ষা করে দেখবার জন্য মওলানা মাশহাদী সাহেবের অফিস রুমে প্রবেশ করলেন। তার সঙ্গে মিঃ হাসান, মিঃ হুদা এবং কয়েকজন পুলিশ অফিসার ছিলেন।

মিঃ আরিফ অফিস রুমে প্রবেশ করেই প্রথমে আবিষ্কার করলেন, তার টেবিলে একটি অর্ধদগ্ধ চুরুট পড়ে আছে। তিনি চুরুটটি হাতে তুলে নিয়ে মওলানা মাশহাদীর ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—মওলানা মাশহাদী কি চুরুট পান করতেন?

ম্যানেজার বলে উঠলেন—না, তিনি চুরুট পান করতেন না। তিনি সিগারেট পান করতেন।

মিঃ আরিফ চুরুটটি উঁচু করে ধরে বললেন—এটি তবে কে পান করেছিলো?

ম্যানেজার মাথা চুলকে বললো—ঠিক বলতে পারছি না স্যার।

মিঃ আরিফ চুরুটটি কাগজে মুড়ে পকেটে রাখলেন। তারপর কাগজপত্র যা টেবিলে ছিলো, নেড়েনেড়ে দেখতেই ম্যানেজার মুখ গম্ভীর করে ফেললেন—স্যার, এসব কাগজপত্র মওলানা সাহেবের মানে-------

ও বুঝেছি, অত্যন্ত গোপনীয়।

না না, ঠিক তা নয় তবে--

তবে আপনি কি বলতে চান?

মানে এসব কাগজপত্র কাউকে দেখানো নিষিদ্ধ আছে।

কিন্তু আইনের চোখে যা কর্তব্য আমি তাই করছি। মওলানা মাশহাদী সাহেবের অন্তর্ধান বাপারে এসব কাগজপত্রের মাধ্যমে 'ক্লু' আবিষ্কার করতে সক্ষম হতে পারি। দেখুন, শুধু টেবিলে রক্ষিত কাগজপত্র নয়, প্রয়োজন হলে আপনাদের আলমারী এবং ড্রয়ারে রক্ষিত কাগজপত্র আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ম্যানেজারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, তিনি মওলানা সাহেবের সহকারীদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

মিঃ হুদার মুখও কালো হয়ে উঠেছে। মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে তিনি মওলানা সাহেবকে বহু সাহায্য করেছেন। এ ব্যাপারে ঘাটতে গেলে মিঃ হুদার সঙ্গে আরও কিছুসংখ্যক পুলিশ অফিসার জড়িয়ে পড়বেন। তাই মিঃ হুদাও বললেন—স্যার, মওলানা সাহেবের অন্তর্ধান ব্যাপারে কাগজপত্র ঘেটে কোনো ফল হবে মনে হয় না।

মিঃ আরিফ চৌধুরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ফল হবে কি না আমি জানি। আপনি কাগজপত্র সব পরীক্ষা করেন দেখুন এবং পুলিশ অফিসে জমা দিন।

এবার মিঃ হুদার মুখমণ্ডল স্বচ্ছ হয়ে এলো, আগ্রহভরা কণ্ঠে বললেন—স্যার, আমি নিজে সব পরীক্ষা করে দেখবো এবং সন্দেহ জনক কাগজপত্র পেলে পুলিশ অফিসে জমা দেবো।

মিঃ আরিফ মিঃ হুদার উপর এইসব কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার এবং সঠিক রিপোর্ট পেশ করার দায়িত্ব দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

মিঃ আরিফ চৌধুরী এবং তাঁর সহকারি বিদায় গ্রহণ করলেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মিঃ হুদা, এতক্ষণে তাঁর দেহে প্রাণ ফিরে এলো যেন। ম্যানেজার এবং মিঃ হুদার মধ্যে গোপনে কিছু আলাপ-আলোচনা হলো তখনকার মত।

❑

পুলিশ মহলে মওলানা মাশহাদীর অন্তর্ধান নিয়ে ভীষণ একটা আলোড়ন শুরু হলো। শুধু পুলিশ মহল নয়, সমস্ত কান্দাই শহরে ছড়িয়ে পড়লো ব্যাপারটা। বিভিন্ন পত্রিকায় নানাভাবে এ নিয়ে লেখালেখি চললো।

পুলিশ সুপার মিঃ আরিফ চৌধুরী মওলানা মাশহাদীর টেবিলের চুরুটটি পরীক্ষা করে জানতে পারলেন, মওলানা সাহেবকে কে বা কারা অজ্ঞান করে নিয়ে গেছে। এর বেশি কোনো ক্লু আবিষ্কারে সক্ষম হলো না পুলিশ মহল।

মিঃ হুদার রিপোর্টে তেমন কোনো কিছু পাওয়া গেলো না সন্দেহজনক কাগজপত্রও পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

শহরে যখন মাশহাদীর অন্তর্ধান নিয়ে ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এমন দিনে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন মাশহাদীর ব্যবসায় সাহায্যকারী আলী আকবর রিজভী। তিনিও এই তেলের ব্যবসায় সহযোগিতা করে লাখপতি বনে গেছেন।

আলী আকবর রিজভী তাঁর শয়নকক্ষ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তিনি নিজে উধাও হয়েছেন, না তাঁকে কেউ হরণ করে নিয়ে গেছে, বলা মুস্কিল।

পুলিশ মহল খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, মওলানা মাশহাদীর অন্তর্ধানের সহিত আলী আকবর রিজভীর নিরুদ্দেশের যোগাযোগ রয়েছে; কারণ উভয়ে একই ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন।

আলী আকবর রিজভীর উধাওয়ের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে ভীষণ এক আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। পথে ঘাটে-মাঠে সর্বস্থানে এই নিয়ে ভীতভাবে সব আলাপ-আলোচনা চললো।

অনেক সন্ধান করেও পুলিশ মহল এ ব্যাপারে কোনো কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো না।

হঠাৎ একদিন মওলানা মাশহাদীর তেল-কারখানায় আগুন জ্বলে উঠলো। সে কি ভীষণ আগুন কোথা থেকে আগুন লাগলো বুঝা গেলো না। শুধু তাই নয়, তেল গুদামেও আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। লক্ষ লক্ষ ড্রাম তেল মজুত আছে এই গুদামে।

ম্যানেজার এবং মাশহাদীর সহকারি কর্মচারিগণ হায় হায় করে উঠলো, ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো। দমকল বাহিনীর কাছে ফোন করা সত্ত্বেও দমকল বাহিনী এলো না কোনো সাহায্য করতে।

ম্যানেজার যখন পুনরায় ব্যস্ত হয়ে রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে দমকল বাহিনীর কাছে ফোন করতে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো এক জমকালো মূর্তি। ম্যানেজারকে উদ্দেশ্য করে বললো—দমকল বাহিনী আসবে না সাহেব, কারণ তারা আপনার ফোন পাবে না। লাইন কেটে দেয়া হয়েছে---

কে—কে তুমি? ম্যানেজারের হাত থেকে রিসিভার খসে পড়লো।

জমকালো মূর্তি বললো—আমি তোমাদের যমদূত। এতদিন যা করেছো তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শোন যা বলছি---

ম্যানেজার ভীতভাবে বললো—তুমিই তাহলে এই আগুন--

হাঁ, আমিই আগুন জ্বেলে দিয়েছি কোটি কোটি জনগণের জীবননাশক তেল তৈরি মিল-কারখানায় আর গুদামে।

এতবড় সর্বনাশ তুমি করেছো?

বছরের পর বছর তোমরা শত শত মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যে সর্বনাশ করেছো, তার তুলনায় এ সর্বনাশ কিছু নয়।

এক্ষুণি পুলিশে জানিয়ে তোমাকে গ্রেপ্তার করাবো।

হাঃ হাঃ হাঃ পুলিশ তোমাদের বাধ্য চাকর, যা হুকুম করো তাই করে তারা। পুলিশের মুখ তোমরা বন্ধ করো পয়সা দিয়ে, এবার আমি পুলিশের মুখ খুলে দেবো এই এটা দিয়ে---জমকালো মূর্তি তার হাতের রিভলভারখানা উঁচু করে ধরলো।

ম্যানেজার ঢোক গিললো, ভয়ে মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। বললো তবু সাহস করে—তুমি আমাকে হত্যা করবে?

এত সহজে হত্যা করবো না, কারণ তোমাদের পাপের মাপ অনুযায়ী বিচার করে হত্যার শাস্তি হবে।

ম্যানেজার বললো—তুমিই বুঝি মালিককে----

হাঁ, আমিই তোমাদের মালিককে সরিয়েছি। শুধু তাই নয়, তোমাদের এই তেল ব্যবসায় যারা লিপ্ত আছে তাদের সবাইকে সরাবো।

কে তুমি?

বললাম তোমাদের যমদূত।

ম্যানেজার এবং জমকালো মূর্তি যখন নির্জনে অফিস কক্ষে কথা হচ্ছিলো তখন বাইরে এবং আশে পাশে মহা হৈ চৈ কলরব শোনা যাচ্ছিলো, তার সঙ্গে তেল কারখানার মেশিন বিস্ফোরিত হবার প্রচণ্ড শব্দ ভেসে

আসছিলো। এইসব আওয়াজের মধ্যে জমকালো মূর্তির হাসি বা কথা বলার শব্দ কারো কানে পৌছাচ্ছিলো না।

ম্যানেজার জমকালো মূর্তির হাতের রিভলভার লক্ষ্য করে শিউরে উঠছিলো, না জানি কখন তার বুকে এসে বিদ্ধ হয় ওর একটা গুলি। তবু সাহস করে বললো—তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেও অল্পক্ষণে দমকল এসে যাবে---

জমকালো মূর্তি বললো—ততক্ষণে তোমাদের মৃত্যুসুধা তৈরির মিল-কারখানা ভস্মীভূত হয়ে যাবে। হাঁ, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তোমার টেবিল থেকে সবুজ রংয়ের রিসিভার তুলে নাও এবং মশিহাদীর সহকারি পার্টনার মকবুল হোসেন, হীরালাল, ফুলচাঁদ ও রুস্তম রিজভীকে ডাকো।

ম্যানেজারের মুখে বিস্ময় জেগে উঠলো, জমকালো মূর্তি সকলের নাম জানলো কি করে; অবাক হলেও সে বললো— তুমি তো তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছো বললে?

তোমাদের অফিসের তার বিচ্ছিন্ন করিনি, কারণ তোমাদের সবকটাকেই আমার প্রয়োজন। নাও, হাতে তুলে নাও ঐ সবুজ রংয়ের রিসিভারখানা।

তাঁরা কি এখন একত্র আছেন?

হাঁ, তারা মিলের দক্ষিণে হেড অফিসে আছে, কারণ আগুন সেদিকে যাবে না বলেই তারা সেখানেই জড়ো হয়ে প্রাণ রক্ষার উপায় খুঁজছে, আর ভাবছে কি করে এই সর্বনেশে আগুন জ্বললো। নাও, বিলম্ব করো না। হাঁ, মনে রাখবে, আমি ঐ আলমারীর আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবো কিন্তু আমার রিভলভারখানা ঠিক তোমার বুক লক্ষ করে উদ্যত থাকবে।

ম্যানেজার সবুজ রংয়ের রিসিভারখানা তুলে নিলো হাতে। হাত তার কাঁপছে —চারিদিকে আগুন, সম্মুখে দন্ডায়মান মৃত্যুদূত ; তবু বললো—হ্যালো, আমি ম্যানেজার বলছি, --হ্যালো, মকবুল হোসেন, হীরালাল, ফুলচাঁদ আর রুস্তম রিজভী—এদের সঙ্গে নিয়ে শীঘ্র চলে আসুন--হ্যালো, দেরী করবেন না---হাঁ হাঁ, আমি ---আমি বি--প---দে--পড়েছি---আমার---চারিদিকে---আ--গু--ন--

জমকালো মূর্তি আর বিলম্ব না করে সরে দাঁড়ালো কিন্তু তার রিভলভার ঠিক রইলো ম্যানেজারের দিকে।

ম্যানেজার একচুল নড়বার সাহসী হচ্ছে না, তার ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি রয়েছে রিভলভারের ডগায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন মওলানা মাশহাদীর সহকারী পার্টনারগণ। সকলের মুখেই উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে, হন্তদন্তভাবে সবাই কক্ষে প্রবেশ করে ম্যানেজার সাহেবকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—সর্বনাশ হয়ে গেলো, সর্বনাশ হয়ে গেলো ম্যানেজার সাহেব---

কেউ বললেন—তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় দমকল বাহিনীর অফিসে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি---

কেউ বললেন—সব নিঃশেষ হয়ে গেলো---

কিন্তু ম্যানেজারের মুখে কোনো কথা নেই, সে যেন বোবা বনে গেছে।

সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ালেন ম্যানেজারকে—কি ব্যাপার, অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে অথচ মুখে কোনো কথা নেই। আগুন দেখে মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

কিন্তু অত ভাববার সময় কারো ছিলো না, ম্যানেজারকে প্রশ্ন করে কোনো জবাব না পেয়ে তাঁরা বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই দেখলেন দরজা বন্ধ।

ঠিক সেই মুহূর্তে জমকালো মূর্তি একটা ওষুধ ছড়িয়ে দিলো কক্ষমধ্যে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, সবাই ঢলে পড়লে মেঝের কার্পেটে। কালো মূর্তির মুখে মুখোস থাকায় তার কোনো পরিবর্তন ঘটলো না।

অন্যান্যের সঙ্গে ম্যানেজারও অজ্ঞান হয়ে পড়লো, তার দেহটা টেবিলে আটকে রইলো আর পা দু'খানা ঝুলতে লাগলো নিচে।

দরজা খুলে গেলো।

জমকালো মূর্তি শিস দিলো, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো কয়েকজন জোয়ান বলিষ্ঠ লোক। প্রত্যেকের দেহেই জমকালো পোশাক, মুখে মুখোস। কাউকে চিনবার জো নেই।

জমকালো মূর্তির নির্দেশমত এক-একজনকে দু'জন বলিষ্ঠ লোক ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে চললো।

এদিকে লোকজনের তেমন জটলা ছিলো না সবাই জড়ো হয়েছে মিলের আশে পাশে দূর থেকে আগুন দেখে চিৎকার করছে আর ছুটাছুটি করে বৃথা আগুন নিভানোর চেষ্টা করছে।

জমকালো মূর্তি সর্বাগ্রে পিছনে তার সঙ্গীরা এক-একজনের সংজ্ঞাহীন দেহ বয়ে নিয়ে চলেছে। অদূরে একটি তেলবাহী ট্রাকে কয়েকটা ড্রাম বসানো আছে। ড্রামগুলো তেলভর্তি ড্রামের মত যদিও সাজানো কিন্তু আসলে সবগুলো খালি ছিলো।

জমকালো মূর্তির নির্দেশে সংজ্ঞাহীন দেহগুলোকে এক-একটা খালি ড্রামে ভর্তি করে ফেললো তার সঙ্গীরা। বাহির থেকে কেউ যেন বুঝতে না পারে সেগুলো খালি ড্রাম।

জমকালো মূর্তি তার সঙ্গীকে গাড়িতে ড্রামের আড়ালে উঠে বসার ইংগিত করে নিজ দেহ থেকে জমকালো ড্রেস খুলে ফেললো। নিচে বেরিয়ে এলো ড্রাইভারের ড্রেসে। দ্রুত ড্রাইভ আসনে উঠে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো সে।

এদিকে দমকল বাহিনী যখন এসে পৌঁছলো তখন কান্দাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ তেল ব্যবসায়ী মওলানা মাশহাদীর তেলের মিল পুড়ে ভষ্মীভূত হয়ে এসেছে প্রায়। আকশচুম্বী অগ্নির লেলিহান শিখা কান্দাই শহরকে আলোকিত করে তুলছে।

গুদামে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

তেলভর্তি ড্রামগুলো এক-একটা কামানের গোলার মত আওয়াজ করে ফেটে পড়ছে। কানে যেন তালা লেগে যাচ্ছে।

সেকি ভীষণ দৃশ্য!

চারিদিক থেকে অগণিত দমকল বাহিনী এসে পড়েছে তারা প্রাণপণে আগুন নিভানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু আগুন যেন আরও লেলিহান শিখা বিস্তার করে আকাশপথে উঠে যাচ্ছে।

এমন অগ্নিকাণ্ড কান্দাই শহরে কোনো দিন ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ সমস্ত কান্দাই শহরে ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ ফোর্সসহ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘটনাস্থলে এসে পড়লেন কান্দাই পুলিশ সুপার মিঃ আরিফ চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার। সঙ্গে মিঃ লাউলংও এলেন ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ জেনে। অবশ্য তাঁর আসার কারণ ছিলো; কেননা, আজ যে তেল মিল-কারখানায় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে কয়েকদিন পূর্বে তার মালিক অদ্ভুতভাবে উধাও হয়েছেন। পার্টনার আলী আকবর রিজভীও নিখোঁজ হয়েছেন বিস্ময়করভাবে।

নিশ্চয়ই অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে এইসব নিখোঁজ ব্যাপারের যোগাযোগ আছে পুলিশ মহলে এই রকম সন্দেহ করা হচ্ছে এবং সেই কারণেই পুলিশ মহল ছুটে এসেছে কর্তব্য সাধনে।

❑

ইরানীকে বনহুর বন্দী করে রাখলেও আসলে সে চুপ রইলো না। যে কক্ষে ইরানী বন্দী ছিলো সেই কক্ষের দেয়ালে, মেঝেতে বিছানার নিচে সব যায়গায় অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলো কোথাও বেরুবার কোনো পথ আছে কিনা।

এখানে তার জন্য সব কিছুর ব্যবস্থা ছিলো। স্নানাগার পাঠাগার, বিশ্রামকক্ষ, খাবার কক্ষ কিন্তু আশ্চর্য, কোনো কক্ষ দিয়েই বাইরে যাবার কোনো পথ ছিলো না। খাবার কক্ষে দুধের টিন, চিনি-রুটি, মাংসের কাটলেট, কিছু কিছু ফলমূল যা অনেক দিন ভাল থাকবে, এই ধরনের খাবার যথেষ্ট ছিলো। ইরানীর খাওয়ার কোনো অসুবিধা ছিলো না। কিন্তু ইরানী আসলে বন্দিনী হয়ে থাকার মেয়ে নয়। মনসুর ডাকুর মেয়ে—কালনাগিনীর মত ভয়ঙ্কর ছিলো সে।

একদিন ইরানী স্নানাগারের মধ্যে আবিষ্কার করলো একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গমুখ।

ইরানী সেই সুড়ঙ্গমধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো। সুড়ঙ্গমুখটা জলোচ্ছ্বাসের নিচে থাকায় সহসা বুঝতে পারে না। ইরানী অতি কৌশলে এই সুড়ঙ্গমুখ আবিষ্কার করে ফেললো। দু'চোখে তার আনন্দদ্যুতি। এবার সে বাইরের জগতে ফিরে যেতে পারবে।

ভিতরে যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত মনে হচ্ছে। ইরানীর খুশি ধরছিলো না যেন—সে ভাবছে এবার দস্যু বনহুরকে দেখাবে মজাটা তকে বন্দী করে রাখলেও বন্দী সে নেই।

সুড়ঙ্গপথ দিয়ে প্রবেশ করবার সময় জলোচ্ছ্বাসের পানিতে তার দেহের বসন সিক্ত হয়ে গিয়েছিলো, কাজেই ঠান্ডায় কাঁপতে শুরু করলো তার দেহটা। সুড়ঙ্গমধ্যে উঁচু-নীচু ছোট বড় পাথরের স্তর থাকায় চলতে অসুবিধা হচ্ছিলো খুব ইরানীর, তবু সে এগিয়ে চলেছে সম্মুখে। জমাট অন্ধকার চারিদিকে, নিজের হাতখানাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বারবার মাথায় আঘাত

লাগছিলো, হাতড়ে হাতড়ে অগ্রসর হচ্ছে ইরানী। বহুক্ষণ চলার পর হাঁপিয়ে পড়লো সে এই সুড়ঙ্গপথের যেন শেষ নেই।

বসে বসে জিরিয়ে নিলো সে কিছুক্ষণ।

আধঘন্টা বিশ্রাম করার পর আবার উঠে পড়লো ইরানী, গুটি গুটি মেরে চলতে লাগলো দেয়াল ধরে ধরে। হঠাৎ ইরানী শিউরে উঠলো, ওদিকে যদি কোনো পথ না থাকে তাহলে কি হবে? এই অন্ধকারে আর কতদূর এগুনো যাবে? তবু চলতে লাগলো—সে বুঝতে পারলো, সুড়ঙ্গ মধ্যে যখন নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে না তখন নিশ্চয়ই ওদিকে হাওয়া প্রবেশের কোনো পথ বা মুখ আছে।

ইরানী প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে চলতে লাগলো। এই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে কোনো হিংস্র জীব ওঁৎ পেতে আছে কিনা কে জানে! ডাকুকন্যা সে, মৃত্যুকে ভয় করে না। উদ্দেশ্য তার যেমন করে হোক, দস্য বনহুরকে কাবু করতেই হবে। তার পিতাকে বনহুর বারবার নাজেহাল করেছে, তার সমুচিত শাস্তি দিতে হবে। ইরানীর মনে প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলে উঠে।

মরিয়া হয়ে সে এগিয়ে চলেছে, পাথরে হোঁচট খেয়ে পায়ের আংগুল দিয়ে রক্ত ঝরছে। কপালের স্থানে স্থানেও চোট লেগে ফুলে উঠেছে এক জায়গায় কেটে রক্ত ঝরছে।

আরও কিছু সময় চলার পর হঠাৎ ইরানীর কানে ভেসে এলো পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর আওয়াজ কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। বহু দূর থেকে যেন শব্দটা ভেসে আসছে।

ইরানী থমকে দাঁড়ালো, সে বুঝতে পারলো এই সুড়ঙ্গমুখ শেষ হয়েছে এমন কোনো এক স্থানে যেখানে মানুষ রয়েছে। তার পালানোর আশা উবে গেলো। তবু দমলো না ইরানী এগিয়ে চললো ধীরে ধীরে। মনকে সে কঠিন করে নিলো—মরতে হয় মরবে তবু ফিরে যাবে না।

সুড়ঙ্গমুখ আবার বেশ ছোট হয়ে আসছে, যেমন ছিলো প্রবেশকালে। কিন্তু আর বেশিদূর এগুতে হলো না, একটা আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার। শুধু আলোকরশ্মি নয়, কণ্ঠস্বর এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এই কণ্ঠ যে তার বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে; মাঝে মাঝে হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। এ যে সেই অদ্ভুত হাসি! ইরানি অতি সতর্কভাবে সুড়ঙ্গমুখে এসে দাঁড়ালো যাতে তাকে দেখা না যায় এবং সে যেন সব দেখতে পায় । বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো ইরানী দেখলো সুড়ঙ্গমুখ যেখানে শেষ হয়েছে সেটা একটা

বিরাট গুপ্তগুহা। নির্জন বাংলোর অভ্যন্তরে এমন যে রহস্যময় সুড়ঙ্গ রয়েছে কেউ বুঝতে পারবেনা।

ইরানী সুড়ঙ্গমধ্যে আত্মগোপন করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সম্মুখের দিকে, দেখলো কতকগুলো লোককে হাতে এবং পায়ে শিকল পরানো অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। লোকগুলোর চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। সুপুষ্ট, নাদুস নুদুস, দেহের পোশাক-পরিচ্ছদ মূল্যবান। কারো পরনে স্যুট, কারো বা শেরোয়ানী-পা-জামা, কারো বা পরনো ধুতি সার্ট। চুলগুলো এলোমেলো, মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে ভয়ার্ত করুণ চোখে অসহায় দৃষ্টি। লোকগুলোকে দেখে বলির পূর্বে ছাগলের কথা মনে পড়ছে। ইরানী নিষ্পলক বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। এই বন্ধনযুক্ত ব্যক্তিগুলির সম্মুখে দণ্ডায়মান দু'টি ব্যক্তি, তাদের দেহে জমকালো পোশাক। একজনের হাতে জমকালো আগ্নেয় অস্ত্র রিভলভার। সেই গুপ্তকক্ষের দেয়ালে মশাল জ্বলছে দপ্ দপ্ করে। মশালের আলোতে জমকালো মূর্তির হস্তের রিভলভার খানা ঝকমক করছে। তার সঙ্গে দেহের কালো পোশাকও ঝক্-মক্ করছে যেন দেখলে শিউরে উঠে শরীর।

ইরানী রুদ্ধনিশ্বাসে তাকিয়ে দেখছে, জমকালো মূর্তির প্রথম জন তার পরিচিত-স্বয়ং দস্যু বনহুর। দ্বিতীয় জনকে চেনে না ইরানী। বনহুরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে---নামাজ পড়ে কপালে দাগ ফেলেছেন মওলানা সাহেব, বেহেস্তের পথ আপনার জন্য তো উন্মুক্ত রয়েছে, কাজেই মরতে কোনো আপত্তি আপনার নেই জানি। হাঁ বলুন কিভাবে আপনি বেহেস্তে যেতে চান?

সম্মুখস্থ লোকটিই মওলানা মাশহাদী, কান্দাই-এর সর্বশ্রেষ্ঠ তেল ব্যবসায়ী। বনহুরের কথায় ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন শুধু; কোনো কথা বললেন না।

বনহুর ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে বললো—এত পুণ্যি করেও বেহেস্তে যেতে নারাজ মনে হচ্ছে যেন। বেহেস্তে যাবার পূর্বে অবশ্যি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে মওলানা সাহেব। একটু থামলো বনহুর, তারপর দু'পা সম্মুখে এগিয়ে দাঁড়ালো—বলুন আপনার সঙ্গী যারা এখানে আপনার সঙ্গে জান্নাতে যাবার জন্য অংশী হতে এসেছেন, তাদের কার সঙ্গে আপনার কেমন সম্বন্ধ?

মওলানা মাশহাদী ভয়ার্ত দৃষ্টি তুলে একবার বনহুরকে দেখে নিয়ে মাথাটা নত করলেন।

বনহুর বললো আবার —বেশিক্ষণ আপনাদের নিয়ে সময় কাটাবার অবসর আমার নেই, এজন্য আমি দুঃখিত। জবাব দিতে বিলম্ব হলে বাধ্য হবো জোর করে জবাব আদায় করতে। রিভলভারখানা দোলালো বনহুর কথার ফাঁকে।

মওলানা শুকনো ঠোঁট দু'খানা জিভ দিয়ে চেটে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে বললেন—আমাকে পানি দাও।

হাঃ হাঃ হাঃ, পানি —পানি নয়, জান্নাতের দরজায় হুর পরীরা আপনার জন্য শারাবান তহুরা নিয়ে অপেক্ষা করছে। বেহেস্তের শরবৎ পানের জন্য অপেক্ষা করুন আর কিছুক্ষণ। আপনি নাপাম বোমার গ্যাস মিশিয়ে তেল তৈরি করে দেশের অগণিত জনগণের যে উপকার করেছেন তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি। কারণ প্রতিদিন আপনি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে জান্নাতে পাঠাবার সুব্যবস্থা করেছেন। সেইজন্য দুনিয়ার বিস্বাদ পানি আপনার জন্য নয়, আপনার জন্য বেহেস্তি শারাব। এবার বলুন এদের মধ্যে কার সঙ্গে আপনার ব্যবসার কেমন সম্বন্ধ?

ভয়ার্ত চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকালেন মওলানা মাশহাদী তারপর ঢোক গিলে বরলেন—এরা সবাই আমার ব্যবসার অংশীদার।

কি রকম, অর্থ দিয়ে না পরিশ্রম দিয়ে এরা আপনার তেল ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করেছেন?

মওলানা মাশহাদী আলী আকবর রিজভীর দিকে তাকিয়ে বললেন—এর সঙ্গে আমার অর্থের যোগাযোগ। আমার ব্যবসায় আলী আকবর রিজভীর বহু অর্থ রয়েছে।

তাহলে সে আপনার অংশীদার কি বলেন?

হাঁ তবে সমান নয়।

আপনার চেয়ে কতগুণ কম হবে আন্দাজ?

সিকি অংশীদার।

আর এরা? বনহুর অন্যান্যের সঙ্গে ম্যানেজারকেও দেখালো।

মওলানা মাশহাদী বললেন—এরা সবাই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এরা অর্থ দিয়ে কেউ অংশীদার হননি--

দেখুন মওলানা সাহেব, আপনি সঠিকভাবে আমার কথার জবাব দিবেন। কারণ আপনার উত্তরের উপর নির্ভর করছে এদের জান্নাতে যাবার টিকেটের হার। হাঁ, এরা তাহলে আপনার কর্মচারী বলতে পারেন।

হাঁ, আমার ব্যবসায় এরা সহায়তা করার জন্য এদের আমি মোটা মাহিনা---

মানে মোটা অঙ্ক দিয়ে থাকেন, এই তো?

হাঁ।

শুধু কি এরাই আপনাকে সাহায্য করে থাকেন, না আরও লোক আছে আপনার সাহায্যকারী? সত্যি কথা বলবেন কিন্তু---বনহুর রিভলভার নাড়াচাড়া করছিলো আর পায়চারী করছিলো আপন মনে।

বনহুরের বুটের আওয়াজ নির্জন বাংলোর অভ্যন্তরে ভূগর্ভস্থ গুপ্ত গুহার মেঝেতে অদ্ভুত এক শব্দ সৃষ্টি করে চলেছে। আর কোনো শব্দ নেই, শুধু বুটের আওয়াজের প্রতিধ্বনি আর মাঝে মাঝে বনহুরের গম্ভীর কঠিন কণ্ঠস্বর যেন কেঁপে কেঁপে সমস্ত কক্ষমধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

ইরানী স্তব্ধ হয়ে শুনছে এবং আশ্চর্য হয়ে দেখছে।

মওলানা মাশহাদী বললেন—এরা আমার কান্দাই শহরে তেল ব্যবসায় সাহায্য করে থাকেন। কান্দাই-এর বাইরেও আমার সহকারী কর্মচারী আছেন যাদের সাহায্যে আমার তেল দেশ-বিদেশে পরিবেশন হয়ে থাকে।

হুঁ, আপনার ব্যবসা দেখছি বহু দেশে বিস্তার লাভ করেছে। আচ্ছা বলুন, কোন কোন দেশে আপনার তেলের কারবার চালু আছে?

মওলানা সাহেবের মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিলো না, তিনি প্রাণ ভয়ে ফাঁসীর মঞ্চের আসামীর মত কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিচ্ছিলেন আর অন্য সকলে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো মওলানা মাশহাদী আর বনহুরের মুখে। তাদের অবস্থাও মর্মস্পর্শী, এক একজন যেন জীবন্ত শয়তানের মত কুঁকড়ে গেছে যমদূতের ভয়ে।

বললেন মওলানা সাহেব—পৃথিবীর অনেক দেশেই আমার কোম্পানি থেকে তেল চালান হয়ে থাকে। কান্দাই, জম্বু, ঝাম মন্থনা দ্বীপ--

থামলেন কেন, বলুন আর কোন্ কোন্ দেশে?

বোম্বে, কলিকাতা---

ভারতেও দেখছি আপনি তেল ব্যবসার পসার জমিয়েছেন। আর কোন দেশে? পাকিস্তানে?

জ্বি হাঁ, পাকিস্তানেও আমার ব্যবসা চলছে--

পুলিশ একবার আপনার পাকিস্তান ব্যবসা কেন্দ্রে হানা দিয়েছিলো?

হাঁ।

কিন্তু পুলিশের মুখ আপনারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন পয়সা দিয়ে?

না, মানে মানে---

বলুন হাঁ!

জ্বি হাঁ--জ্বি হাঁ---

আপনার সেই বিশ্বব্যাপী তেল পরিবেশক তেল তৈরি কারখানাটি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে—মানে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তার সঙ্গে ভস্মীভূত হয়েছে আপনার তেলাগার যে তেলাগারে আপনার কোটি কোটি টাকার তেল মজুত ছিলো।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন মওলানা মাশহাদী সাহেব। তিনি করুণ চোখে তাকালেন সঙ্গীদের মুখে।

ম্যানেজার এবং অন্যান্য সকলে প্রাণের চিন্তায় অস্থির তাই তারা কোনো কথাই মালিককে জানাতে পারেনি। এবার বলে উঠলো ম্যানেজার —সব গেছে---সব নিঃশেষ হয়ে গেছে স্যার---সেও কেঁদে উঠলো এবার উচ্ছ্বাসিতভাবে।

বনহুর অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো—হাঃ হাঃ হাঃ---বনহুরের হাসির শব্দে ভূগর্ভ নিস্তব্ধ কক্ষের পাথুরের দেয়ালগুলোর থর থর করে কেঁপে উঠলো যেন। মুহূর্তে থেমে গেলো মওলানা মাশহাদী এবং ম্যানেজার সাহেবের রোদন। নাকের পানি আর চোখের পানি এক করে তাকালেন বনহুরের মুখের দিকে। হাত-পায়ে শিকল বাঁধা থাকায় চোখের পানি মুছে ফেলার কোনো উপায় ছিলো না।

বনহুর বললো—পূর্বে সাবধান করা সত্ত্বেও আপনাদের জঘন্য ব্যবসা পুরাদমে চালিয়ে আজ রোদন করতে লজ্জাবোধ হচ্ছেনা? রহমান?

বলুন সর্দার?

ইরানী আড়াল থেকে চমকে উঠলো দস্যু বনহুরের পাশে দণ্ডায়মান জমকালো পোশাক পরা ব্যক্তিই তাহলে তার সহকারি রহমান। ইরানী তার বাবার মুখে শুনেছিলো, দস্যু-বনহুরের সহকারি প্রধান অনুচরের নাম রহমান। অবাক হয়ে সে দেখতে লাগলো।

বনহুর বললো—মওলানা সাহেবকে জান্নাতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে সর্বশেষে। কারণ তিনি এদের মালিক, আগে যাবেন তাঁর কর্মচারী এবং সহকারিগণ। হাঁ, আর একটি কথা মওলানা সাহেব, বলুন কান্দাই পুলিশ অফিসার মিঃ হুদা ও মিঃ কাইয়ুমের সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ? বলুন?

তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।

আবার মিথ্যা কথা ; প্রচণ্ড ধমক দিলো বনহুর। একটু থেমে বললো—মিঃ হুদাই বললেন আপনার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ছিলো। রহমান, মিঃ হুদাকে হাজির করো।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো —সঙ্গে কান্দাই দুর্নীতি দমন বিভাগের পুলিশ অফিসার মিঃ কাইয়ুম হেলালী, কান্দাই থানা অফিসার মিঃ নজমুল হুদা এবং আরও একজন পুলিশ অফিসার।

বনহুরের সম্মুখে এনে দাঁড় করালো তাদের।

প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া পরানো।

বনহুর মিঃ কাইয়ুম, মিঃ হেলালী এবং মিঃ হুদাকে একনজর দেখে নিলো, তারপর বললো—আপনারাই দেশের দুর্নীতি দমন করে থাকেন, চমৎকার আপনাদের নীতিবোধ। এমন না হলে দেশের উন্নতি সাধন হবে কি করে? আচ্ছা মিঃ হুদা, বলুন দেখি এই মওলানা সাহেবের সঙ্গে আপনার কেমন ভাব?

মিঃ কাইয়ুম হেলালী মিঃ হুদা এবং তাদের সঙ্গী ভদ্র লোকটির মুখে ভয়, বিস্ময় আর চঞ্চলতা। মওলানা মাশহাদী এবং তাঁর সঙ্গীদের এখানে এমন অবস্থায় দেখে তাদের পিলে চমকে গেছে, বিবর্ণ মুখে তাকিয়ে দেখছে এক-একবার করে।

বনহুরের কথায় মিঃ হুদা গলায় সাহস টেনে বললেন—আমি উনাকে চিনি এইমাত্র। তাছাড়া উনার সঙ্গে আমার কোনো ভাব বা সম্বন্ধ নেই।

বনহুর রিভলভার দিয়ে মিঃ হুদার তলপেটে খুব জোরে আঘাত করে বললো—আবার মিথ্যা কথা।

রিভলভারের আঘাতটা খুব জোরে লেগেছিলো মিঃ হুদার তলপেটে তিনি যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে বললেন —বলছি--বলছি--

বলুন? একবর্ণ মিথ্যা বললে---

বনহুরের কথা শেষ হয় না বলে উঠেন মিঃ হুদা—মওলানা সাহেব আমাকে টাকা দিয়ে মিঃ কাইয়ুম সাহেবকে হাতে রেখে তাঁর ব্যবসা--- থেমে পড়লেন মিঃ কাইয়ুমের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে।

বনহুর বুঝতে পারলো মিঃ কাইয়ুম দুর্নীতি দমন বিভাগের উপরওয়ালা কাজেই তার সম্বন্ধে বলতে ভয় পাচ্ছেন, বিশেষ করে তার সাক্ষাতে। বললো বনহুর—মিঃ হুদা আপনি মিছামিছি ভয় পাচ্ছেন আপনাদের উপরওয়ালা সাহেবকে, কারণ তিনি আর আপনি এখন একেবারে সমান। যেমন পৃথিবীতে মানুষ ধনী-দরিদ্র বহুরকম থাকে কিন্তু মৃত্যুর পর তারা যখন হাশরের ময়দানে আবার জেগে উঠবে তখন তারা সবাই সমান। সবাই ইয়া নফসী ইয়া নফসী বলে বিলাপ করতে থাকবেন, আজ আপনারা আমার এই দরবারে সবাই সমান অবশ্য জীবিত অবস্থাতেই। হাঁ, এবার নির্ভয়ে বলুন।

মিঃ হুদা প্রাণভয়ে সব বলে গেলেন, কিভাবে মওলানা মাশহাদী পুলিশের মুখ বন্ধ করে তাঁর ব্যবসা চালিয়ে চলেছিলেন। পুলিশ মহলের যারা প্রধান কর্মকর্তা তাঁরা এ সবের কিছু জানেন না, একথাও প্রকাশ পেলো মিঃ হুদার কথায়। আরও জানা গেলো, কিভাবে তারা বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ হতে মোটা অঙ্কের ঘুষ খেয়ে তাদের অসৎ ব্যবসায় সহায়তা করে দেশবাসীদের চরম অবস্থার সৃষ্টি করেছেন বা করে চলেছেন। উপরওয়ালা কর্মকর্তাগণের মধ্যেও অনেকেই লোভের মোহে অন্ধ হয়ে নিম্নস্তরের কর্মচারী দ্বারা ঘুষ গ্রহণ করে থাকেন। এইসব কর্মকর্তাই হলেন দেশ ও দশের সর্বনাশের মূল। দেশের উপরওয়ালা কর্মকর্তাগণ যদি চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, সৎ ব্যক্তি হতেন তাহলে দেশ আজ এমন অধঃপতনে যেতো না।

বনহুর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সব শুনলো। শুধু বনহুর নয়, মওলানা মাশহাদী এবং তাঁর সহকর্মিগণও শুনলেন। পুলিশ অফিসারদ্বয়ও শুনলেন। আর শুনলো ইরানী আড়াল থেকে সব কথা।

মিঃ হুদার মুখ দিয়েই বের হলো আরও কয়েকজন অসৎ ব্যবসায়ীর নাম, যারা বিভিন্ন জিনিসে ভেজাল মিশিয়ে জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

বনহুর রহমানকে আদেশ দিলো এদের পাকড়াও করে তার দরবারের হাজির করতে।

রহমান বললো– আচ্ছা সর্দার, আপনার কথামত সবাইকে আমি খুঁজে বের করবো এবং হাজির করবো দরবারে।

বনহুর এবার এগিয়ে এলো মওলানা মাশহাদীর সম্মুখে। বাম হাতে তাঁর চুলের গোছা ধরে টেনে বের করে আনলো সারির মধ্য থেকে । দাঁতে দাঁত পিষে কঠিন কণ্ঠে বললো সব তো শুনলেন, এবার বলুন কি পুরস্কার এর জন্য চান?

মওলানা মাশহাদীর মুখ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, কোনো কথা তিনি বললেন না। শুধু ভয়ার্ত চোখে তাকাতে লাগলেন।

বনহুর বললো— রহমান?

বলুন সর্দার?

এই মুহূর্তে অগ্নিদগ্ধ শলাকা দ্বারা মওলানা সাহেবের হাত দু'খানা ছিদ্র করে দাও, এটা তাঁর প্রথম পুরস্কার। কারণ ঐ হাত দ্বারাই তিনি বহু অর্থ ঘুষ দিয়েছেন এবং বহু অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

রহমান করতালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন জমকালো লোক একটি জ্বলন্ত কয়লার কড়াই হস্তে কক্ষে প্রবেশ করলো। জ্বলন্ত কড়াইয়ের মধ্যে দুটি লৌহশলাকা। অগ্নিদগ্ধ শলাকা দুটি লাল হয়ে উঠেছে।

কক্ষমধ্যে বন্দীগণ শিউরে উঠলেন।

মওলানা মাশহাদী জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটছেন, চোখ দুটো তাঁর ভয়ে গোলাকার হয়ে উঠেছে।

বনহুরের ইঙ্গিতে কালো লোক দুটি অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দুটি তুলে মওলানা সাহেবের নিকটে এসে দাঁড়ালো।

মওলানা সাহেব হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন— এবারের মত আমাকে ক্ষমা করে দিন, আর আমি কোনো দিন অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করবো না।

আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তাছাড়া সম্মানিত ব্যক্তি, 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললেই ভাল দেখাবে। হাঁ, এবার ইনার হাত দু'খানা মুক্ত করে দাও।

রহমান মওলানা মাশহাদীর হাতের লৌহশিকল খুলে দিলো।

বনহুর মওলানাকে লক্ষ্য করে বললো— নিন, এবার হাত পাতুন, আপনার প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করুন।

মওলানা মাশহাদী ধপ্ করে বসে পড়লেন দস্যু বনহুরের পায়ের কাছে, করুণ কণ্ঠে বললেন— এবারের মত আমাকে মাফ করো। আমি নাকে কানে খৎ দিচ্ছি... ... ...

বনহুর হেসে উঠলো অট্টহাসিরত—দস্যু বনহুর কোনোদিন অপরাধীকে ক্ষমা করে না মওলানা সাহেব। আপনি যা কর্ম করেছেন তার পুরস্কার শুধু নেবেন। রহমান?

রহমান মওলানা মাশহাদীকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো।

জমকালো লোক দুটি এবার মওলানার হাত দু'খানা দু'জনে এঁটে ধরে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা বিনা দ্বিধায় হাতের তালুতে প্রবেশ করিয়ে দিলো।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন মাশহাদী সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভদ্রলোক অস্ফুট শব্দ করে চোখ বন্ধ করলেন, তাদের দেহে প্রাণ আছে কিনা বুঝা যাচ্ছে না, নীরব হয়ে গেলেন সবাই।

বনহুর বললো— ম্যানেজার ছাড়া প্রত্যেককে এই পুরস্কার দেওয়া হোক।

ভীষণভাবে আর্তনাদ করে উঠলো সবাই।

বনহুর হাসিতে ফেটে পড়লো— এতদিন আরাম-আয়েশে ঐ হাত দু'খানা দিয়ে সুকাজ করে গেছেন। আজ তার ফলাফল ভোগ করুন। রহমান, বিলম্ব করো না।

জমকালো লোকগুলো পুনরায় অগ্নিদগ্ধ শলাকা নিয়ে আলী আকবর রিজভীর দিকে অগ্রসর হলো।

রহমান খুলে দিলো তাঁর হাতের বন্ধন।

মওলানা মাশহাদী তখন প্রাণফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। আলী আকবরকেও তার পুরস্কার দেওয়া হলো। তারপর এক একজনকে এই চরম শাস্তি দিয়ে চললো দস্যু বনহুর।

ওরা যখন যন্ত্রণায় প্রাণফাটা চিৎকার করে উঠেন, বনহুর তখন হাসিতে ফেটে পড়ে, যার যে কাজের বর্ণনা দিতে থাকে সে।

প্রত্যেকের হাতে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করানো শেষ হলো। মিঃ হুদাও বাদ পড়লো না, তার হাতের তালুতে যখন অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দ্বারা ছিদ্র করা হয় তখন তিনি নিজের পুলিশের চাকরি জীবনকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগলেন।

বনহুর বললো— মিঃ হুদা, আপনি পুলিশ চাকরিকে অযথা দোষারোপ করছেন। চাকরি সবই ভাল যদি আপনি ন্যায়নীতি মেনে কাজ করেন। যে কোনো চাকরির মাধ্যমে আপনারা দেশের জনগণের উপকার করতে পারেন, কিন্তু আপনারা তা না করে মানুষ হয়ে মানুষের বুকের রক্ত শুষে নেন। অর্থের মোহে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে জানোয়ার বনে যান। আজ যে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, এটা যেন লোকসমাজে প্রচার লাভ করে, তার জন্য আপনাদের পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাণহীন দেহগুলো কান্দাই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় রেখে আসা হবে। আপনাদের দেহের উপর থাকবে আপনাদের সুকর্মের বর্ণনালিপি।

বনহুরের কথাগুলো যেন এক-একটা বজ্রধ্বনির মত শোনাচ্ছে, শিউরে উঠছেন মওলানা মাশহাদী এবং অন্য সকলে। হাতের যন্ত্রণা যেন এই মুহূর্তে ভুলে গেছেন তাঁরা। নিজ নিজ পরিণতির জন্য রোদন করছেন সবাই। আজ কেই কারো নয়, কেউ আজ কাউকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন না বা কেউ কারো দিকে তাকিয়ে দেখছেন না।

এবার বনহুরের রিভলভার গর্জে উঠলো।

কেউ কিছু জানবার পূর্বেই লুটিয়ে পড়লো মওলানা মাশহাদীর তেল কোম্পানীর ম্যানেজার। শুধু একটা তীব্র আর্তনাদ জেগে উঠলো রিভলভারের গুলীর সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যানেজারের রক্তাক্ত দেহ মেঝেতে পড়ে বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেলো।

অসহায় করুণ চোখে ভয়, ভীতি আর বেদনা নিয়ে সবাই তাকালো ম্যানেজারের রক্তাক্ত দেহের দিকে।

বনহুর বললো— ম্যানেজার দোষী হলেও তার দোষের পরিমাণ লঘু ছিলো, তাই তাকে অতি সহজে বিদায় দিলাম।

না জানি এবার কার বক্ষ ভেদ করবে বনহুরের গুলী কে জানে। বন্দীগণ মরিয়া হয়ে পড়েছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই যেন পাথর বনে গেছে। এতক্ষণ হাতের যন্ত্রণায় অস্থির ছিলো, ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর ছিলো, সব তারা বিস্মৃত হলো মুহূর্তমধ্যে। দস্যু বনহুরের হস্তে আজ তাদের মৃত্যু সুনিশ্চয়।

ইরানী আড়ালে আড়ষ্ট হয়ে সব দেখছে। ডাকুকন্যা হলেও তার তো প্রাণ আছে, মায়া-মমতা আছে। দস্যু বনহুর এতখানি হৃদয়হীন,

নির্দয়, নরপিশাচ সে ভাবতে পারেনি। এই মুহূর্তে তার হাতে কোনো অস্ত্র থাকলে সে দস্যু বনহুরকে হত্যা করতেও পিছপা হতো না।

ইরানীর চিন্তাজাল বিছিন্ন হয়ে যায়, আবার বনহুরের রিভলভার গর্জে উঠে। তাকিয়ে দেখলো সে অজ্ঞাত পুলিশ অফিসারটির দেহ ভূতলে গড়াগড়ি যাচ্ছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পাথুরে মেঝেটা।

বনহুরের রিভলভার পুনরায় গর্জে উঠলো, এবার লুটিয়ে পড়লো মওলানা মাশহাদীর একজন কর্মচারী।

মওলানা মাশহাদী বনহুরের পায়ের উপর উবু হয়ে কেঁদে পড়লেন বাঁচাও, আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দাও......

প্রাণ ভিক্ষা...... হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ......

ততক্ষণে জমকালো লোক দুটো ধরে সরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো মওলানা মাশহাদীকে।

বনহুরের রিভলভার একটির পর একটি বক্ষ ভেদ করে চললো।

সর্বশেষ মিঃ হুদা আর মওলানা বাকি রয়েছেন।

বনহুরের চোখ দুটো হত্যার নেশায় জ্বলছে যেন। সেকি অদ্ভুত মূর্তি দস্যু বনহুরের! মিঃ হুদা আকুল হয়ে কেঁদে জোড়হাতে বলে উঠলেন—আমাকে হত্যা করো না, বনহুরের রিভলভারের গুলী তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে গেলো।

মওলানা এবার মেঝেতে বসে মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলেন। নিজের পাপের জন্য অনুতাপে ভেঙ্গে পড়লেন।

বনহুর দাঁত পিষে বললো—আমার কাছে কোনো ক্ষমা নেই। তবে তওবা করে নাও, খোদা যদি তোমাকে ক্ষমা করেন।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বনহুরের রিভলভারের একটি গুলী মওলানা মাশহাদীর মাথার খুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

মাশহাদীর বিশাল দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে যায় মেঝেতে। বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। রক্তের বন্যা বয়ে চলে পাথুরে মেঝেটায়।

ইরানী এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলে। শুনতে পায় সে বনহুরের কণ্ঠ—রহমান, এমনি করে আমাকে দেশের শত্রু বিনাশ করতে হবে।

রহমানের গলার স্বর—সর্দার, এদের সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবো?

হাঁ, যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দেওয়া আছে সেইভাবে কাজ করবে।

রহমান করতালি দিলো।

অমনি কয়েকজন লোক ট্রেচারের মত খাটিয়াসহ প্রবেশ করলো। তারপর মৃতদেহেগুলো এক-একটা খাটিয়ায় তুলে নিয়ে প্রস্থান করলো।

সবাই চলে গেলে রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান করলো এবার।

একটা মৃত্যু বিভীষিকাময় থম্‌থমে ভাব সমস্ত কক্ষটাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

ইরানী তখনও দু'চোখে হাত রেখে সুড়ঙ্গমধ্যে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ শুনতে পায় ইরানী— বেরিয়ে এসো।

চমকে চোখ থেকে হাত সরিয়ে নেয় ইরানী। সম্মুখে তাকিয়ে অবাক হয়, দেখতে পায় দস্যু বনহুর তাকে আহ্বান জানাচ্ছে।

ইরানীর মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠে। সে ভাবতেও পারেনি, দস্যু বনহুর তার অবস্থান জানতে পেরেছে। ভয়-বিহ্বল পদক্ষেপে সুড়ঙ্গমধ্য হতে বেরিয়ে এলো ইরানী। দেহটা তার বেতস্‌পত্রের মত থরথর করে কাঁপছে!

বনহুর নিজকে স্বাভাবিক করে নিয়ে একটু হেসে বললো— ইরানী, ডাকুর মেয়ে হয়ে তুমি এত ভীতু?

ইরানী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো— দস্যু বনহুর, তুমি নরপিশাচ।

তারপর আর কি?

শয়তান।

শয়তান আমি নই।

মেঝের রক্তস্রোতের দিকে তাকিয়ে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো ইরানী— এত রক্তপাত করেছ, তুমি শয়তান নও বলতে চাও?

রক্তপাত করলেই সে শয়তান হয় না ইরানী। বনহুর কথার ফাঁকে দেয়ালে একটা সুইচ টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের নীচ দিয়ে হু হু করে জলস্রোত বয়ে এলো, মেঝের চাপ চাপ রক্ত ধুয়ে নিয়ে চলে গেলো স্রোতধারা। সমস্ত মেঝে আবার পূর্বের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেলো।

বনহুর বললো আবার— বলো, এবার তুমি কোন্ শাস্তি চাও আমার কাছে?

তুমি নররক্ত পিপাসু। বেশ, আমার রক্তও যদি তুমি পান করতে চাও, করো। কিন্তু মনে রেখো, আমার বাপু তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

হাসালে ইরানী, আমাকে তুমি হাসালে। দস্যু বনহুর কোনো দিন কারো কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হতে জানে না, ক্ষমা সে কামনাও করে না কারো কাছে।

তুমি জীবন্ত আজরাইল... ...

তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। হাঁ, একটা কথা, তোমার বাবা এবং তোমার বাবার বন্ধু গোমেশ এখন জেলে।

আমার বাবা জেলে?

হাঁ, সেদিন সেই উৎসবমঞ্চেই তার আসল রূপ পুলিশের কাছে প্রকাশ পায় এবং সে আর গোমেশ গ্রেপ্তার হয়।

ইরানী গম্ভীর চিন্তিত হয়ে পড়লো।

বনহুর হেসে বললো— তোমার বাবা আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য ফাঁদ পেতেছিলো, সেই ফাঁদে সে নিজেই আটকা পড়েছে। আর হারিয়েছে তার কন্যাকে। জানো তোমার পরিণতি কি?

ইরানীর দু'চোখে করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠে— তুমি আমাকে হত্যা করবে এইতো?

যদি হত্যা না করি? বনহুর ইরানীর দিকে এগুতে লাগলো।

ইরানী ভীতভাবে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো।

বনহুর এগুচ্ছে, মুখে একটা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসির আভাস। চোখ দুটো যেন তীব্র হয়ে উঠেছে।

ইরানী এবার সত্যি সত্যি ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলো, সে প্রথম দিন বনহুরের দৃষ্টিতে এমন চাউনি লক্ষ্য করেনি, আজ যেন বনহুর মাতালের মত ক্ষেপে উঠেছে। সেদিন বনহুরকে বেশ ভদ্র বলে মনে করেছিলো, আজ তার হৃদয় কেঁপে উঠে। এই নির্জন কক্ষমধ্যে আর দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই যে তাকে বনহুরের কবল থেকে রক্ষা করবে।

বনহুর বললো— তোমার বাবা আমাকে শায়েস্তা করবার জন্য যেমন আগ্রহী, তুমিও তেমনি। কাজেই আমি তোমাকে কিছুতেই আজ রেহাই দেবো না।

ইরানী ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো— তুমি আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও বনহুর ...

মুক্তি। দস্যু বনহুর এত বোকা নয় যে, মুক্তি দেবে মনসুর ডাকুর কন্যা ইরানীকে। তোমাকে আমি কিছুতেই মুক্তি দেবো না। বনহুর ইরানীকে ধরতে যায়।

ইরানী সরে যায় এক কোণে।

বনহুর সরে এসে খপ্ করে ধরে ফেলে ইরানীর ওড়নার এক প্রান্ত।

ইরানী ওড়না ছেড়ে নিয়ে দ্রুত সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে, তারপর প্রাণ পণে ছুটতে থাকে সে। কানে ভেসে আসে বনহুরের অদ্ভুত হাসির শব্দ।

তাকে পালিয়ে যেতে দেখে হাসছে বনহুর।

❑

মিঃ আরিফ চৌধুরীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

টেবিলে ফোনটা একটানা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে চলেছে। রাগতভাবে উঠে এসে রিসিভারটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন— হ্যালো, স্পিকিং আরিফ চৌধুরী... ... কি বললেন, মওলানা মাশহাদীর লাশ পাওয়া গেছে?... ..তাঁর শয়নকক্ষের শয্যায়... ...আচ্ছা এক্ষুণি আসছি।

মিঃ আরিফ যখন ফোনে কথা বলছিলেন তখন মিসেস আরিফ কক্ষে প্রবেশ করছিলেন, স্বামীর কথাগুলো তাঁর কানে প্রবেশ করে। অবাক কণ্ঠে বলে উঠেন—কি বললে, মওলানা মাশহাদীর লাশ পাওয়া গেছে?

রিসিভার রাখতে রাখতে বললেন মিঃ আরিফ— হাঁ, মওলানা মাশহাদীর লাশ নাকি তাঁর শয়নকক্ষের বিছানায় পাওয়া গেছে। মিঃ হাসান ফোন করেছিলেন, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

মিঃ আরিফের চোখেমুখে একটা দারুণ উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠলো।

মিসেস আরিফের মুখে কোনো কথা নেই, তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন—একি আশ্চর্য ব্যাপার, বলো তো? যে মওলানা সাহেবের এত নাম-ডাক তাঁর একি চরম অবস্থা হলো। এতবড় তেল

কারখানা আগুনে পুড়ে ছাই হলো। মওলানা সাহেব নিখোঁজ হলেন। আজ আবার শুনছি তাঁর শয়নকক্ষের বিছানায় তাঁর লাশ ... ...

মিঃ আরিফ পোশাক পরতে পরতে জবাব দিলেন—শুধু কি তাই, মওলানা মাশহাদীর তেল কারখানার ম্যানেজার এবং মাশহাদীর পার্টনার যারা ছিলেন তাঁদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বলো কি?

হাঁ, সবাই তাঁরা নিখোঁজ ... ... কথাটা বলে আরিফ সাহেব ক্যাপ মাথায় চড়ালেন।

মিসেস আরিফ বললেন— চা.নাস্তা না খেয়েই যাচ্ছে?

সময় নেই ... .., কথাটা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন মিঃ আরিফ চৌধুরী।

মিসেস আরিফ চা তৈরি করছিলেন, তিনি থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

❑

পুলিশ অফিসে গাড়ি পৌঁছতেই মিঃ আরিফ চৌধুরী নেমে পড়লেন। ব্যস্ত হয়ে অফিসরুমে প্রবেশ করতেই মিঃ ইয়াসিন বললেন—চলুন স্যার, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

মিঃ আরিফ বললেন— মিঃ হাসান কি মওলানা মাশহাদীর বাসায় অপেক্ষা করছেন?

হাঁ, মিঃ লাউলং এবং মিঃ হাসান সংবাদ পাওয়ামাত্র সেখানে গেছেন।

তাহলে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, চলুন মিঃ ইয়াসিন। বলে মিঃ আরিফ চৌধুরী গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

গাড়িতে বসে নানারকম আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো।

মিঃ আরিফ চৌধুরী বললেন— মিঃ কাইয়ুম এবং মিঃ হুদার অন্তর্ধান সমস্ত পুলিশ মহলে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ তাঁরা কোথায় উধাও হলেন, আশ্চর্য!

মিঃ ইয়াসিন বললেন—মওলানা মাশহাদীর উধাও এবং হত্যাকান্ডের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্বন্ধ নেইতো স্যার?

আমার মনে হয়, মওলানা মাশহাদীর উধাওয়ের সঙ্গে এঁদের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে। বললেন মিঃ আরিফ। তারপর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ

করে বললেন—মিঃ হুদার কাছে আমি কিছু কাগজপত্র দেখার ভার দিয়েছিলাম। মওলানা মাশহাদী সাহেব হঠাৎ তাঁর অফিসরুম থেকে যেদিন নিখোঁজ হন, সেদিন তাঁর টেবিলে একটি অর্ধদগ্ধ দামী চুরুট পাওয়া যায়। আমার মনে তখন সন্দেহ হয়েছিলো এবং চুরুটটি আমি পকেটে রেখে কাগজপত্র দেখার ভার মিঃ হুদার উপর দিয়ে চলে আসি।

মিঃ ইয়াসিন বললেন— তারপর মিঃ হুদা আপনাকে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন?

মিঃ হুদা পরে জানিয়ে ছিলেন, মওলানা মাশহাদীর অফিসরুমে কোনোরূপ সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু মিঃ হুদা আমাকে সেইদিনই গভীর রাতে ফোন করে জানিয়েছিলেন, কে বা কারা তাঁকে হুমকি দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলো।

মিঃ ইয়াসিন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন— স্যার, তার মানে কি?

মানে যেদিন মিঃ হুদা আমাকে মওলানা মাশহাদীর অফিসরুমের কাগজপত্র ইনকোয়ারী রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, ঐদিন তাঁকে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে কে বা কারা চিঠি দিয়েছিলেন?

সে চিঠি কি মিঃ হুদা আপনাকে দেখিয়েছিলেন?

না। মিঃ হুদাকে বলা সত্ত্বেও তিনি সে চিঠি পুলিশ অফিসে জমা দেননি এবং চিঠির কথা যেন চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

মিঃ ইয়াসিনের ভ্রু জোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, তিনি বললেন— নিশ্চয়ই স্যার, এমন কোনো চিঠি যা তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িত ছিলো। যে কারণে তিনি চিঠিখানা ভীতিজনক জেনেও পুলিশ মহলে গোপন করে গেছেন। মিঃ কাইয়ুমও নাকি এমনি ধরনের কোনো চিঠি পেয়েছিলেন শুনেছিলাম?

হাঁ, আপনি ঠিক শুনেছেন মিঃ ইয়াসিন, মিঃ কাইয়ুমকেও এই রকম একটা সাবধানবাণী পত্র দেওয়া হয়েছিলো। জানি না একথা কতখানি সত্য। কারণ, এ চিঠি সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারে না, মিঃ কাইয়ুম কাউকে কিছু বলেননি কোনো দিন।

তবে এ কথা কি করে পুলিশ মহলে জানাজানি হলো ভেবে পাচ্ছি না স্যার?

মিঃ কাইয়ুম সাহেবের চাকর বলেছিলো, কাইয়ুম সাহেব হঠাৎ অন্তর্ধান হবার কয়েক দিন পূর্বে তিনি নাকি একখানা চিঠি পেয়েছিলেন, সেই চিঠিখানা পড়ার পর মালিক কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। চিঠিতে কি লেখা ছিলো চাকর জানে না— তা আজও সকলের কাছে অজ্ঞাত।

কথায় কথায় তাঁদের গাড়িখানা মওলানা মাশহাদীর বাড়ির গেটে প্রবেশ করলো।

বাড়ির ফটকে দারওয়ান ছাড়াও দু'জন পুলিশ রাইফেল হাতে কড়া পাহারা দিচ্ছিলো। তারা মিঃ আরিফ এবং মিঃ ইয়াসিনকে গাড়িতে দেখে সেলুট করে সরে দাঁড়ালো।

গাড়িখানা মওলানা মাশহাদীর রাজপ্রাসাদময় বাড়ির ফটক পেরিয়ে গাড়ি-বারান্দায় এসে থামলো।

এখানেও কয়েকজন পুলিশ কড়া পাহারায় রত ছিলো। মিঃ আরিফ এবং মিঃ ইয়াসিন গাড়ি থেকে নেমে এগুতেই একজন পুলিশ অফিসার বললেন— আসুন স্যার।

মিঃ হাসান ও মিঃ লাউলং সাহেব কোথায়? বললেন মিঃ আরিফ।

পুলিশ অফিসারটি বললেন— তাঁরা উভয়ে মওলানা মাশহাদীর শয়নকক্ষে আছেন।

আচ্ছা চলুন।

মিঃ আরিফ ও মিঃ ইয়াসিন অনুসরণ করলেন পুলিশ অফিসারটিকে।

মিঃ আরিফ এবং মিঃ ইয়াসিন হলঘরের টানা-বারান্দা বেয়ে উপরে উঠতে গেলে তাঁদের কানে নারীকণ্ঠের চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো। হয়তো বা মওলানা মাশহাদীর স্ত্রী এবং আত্মীয়রা কাঁদছেন। পর্দানশীন্ মহিলা, তাই জোরে কাঁদার অধিকার তাদের নেই।

সমস্ত বাড়িখানা কেমন যেন থমথম করছে। শোকের ছায়ার চেয়ে ভীতিভাবটাই যেন বেশি। বাড়ির দারওয়ান, চাকর-বাকর সকলের মুখেই যেন ভয়াতুর ভাব ফুটে উঠেছে।

মিঃ আরিফ মিঃ ইয়াসিন পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে মওলানা মাশহাদীর শয়নকক্ষে এসে হাজির হলেন।

সমস্ত বাড়িটা শ্বেত পাথরে তৈরি। বাড়ির প্রত্যেকটা কক্ষ অতি মূল্যবান এবং সুন্দর আসবাবে সুসজ্জিত। মওলানা মাশহাদীর শয়নকক্ষও মূল্যবান আসবাবে পরিপূর্ণ।

মিঃ আরিফ ও মিঃ ইয়াসিন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই নজরে পড়লো খাটের উপর চিৎ হয়ে শায়িত মওলানা মাশহাদী। কেমন যেন একটা গন্ধ তাদের নাকে প্রবেশ করলো।

মিঃ লাউলং ও মিঃ হাসান মওলানা মাশহাদীর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন একটা চিঠি মনোযোগ সহকারে পড়ছেন।

অন্যান্য দু'চার জন যারা বিশিষ্ট লোক কক্ষমধ্যে ছিলেন তারাও ঝুকে পড়ে লক্ষ্য করছিলেন মিঃ হাসানের হাতের চিঠিখানা।

মিঃ আরিফ ও মিঃ ইয়াসিন এগিয়ে এসে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন কিন্তু দৃষ্টি তাঁদের এসে পড়লো শয্যায় শায়িত মওলানা মাশহাদী সাহেবের মৃতদেহের উপর। মওলানা মাশহাদীর হাত দু'খানা দু'পাশে ঝুলছে, হাতের পাতায় বিরাট ক্ষত-কিন্তু একি। হাতের ক্ষত যেন অগ্নিদগ্ধ মনে হচ্ছে। যে গন্ধটা তাঁদের নাকে প্রবেশ করছিলো তা ঐ অগ্নিদগ্ধ হাতের তালুর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আরও লক্ষ্য করলেন মিঃ আরিফ এবং মিঃ ইয়াসিন, মওলানা মাশহাদীর মাথার দক্ষিণ পাশের কিছুটা অংশ উড়ে গেছে জমাট রক্ত শুকিয়ে চাপ ধরে আছে। জামাকাপড়েও বহু স্থানে রক্তের ছাপ শুকিয়ে কাল হয়ে আছে।

মিঃ লাউলং এবং মিঃ হাসান চিঠি থেকে দৃষ্টি ফেরালেন।

মিঃ হাসান বললেন—স্যার, এই চিঠিখানা মওলানা মাশহাদীর বুকের জামার সঙ্গে আটকানো ছিলো।

মিঃ আরিফ চিঠিখানা হাতে নিয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—এযে দস্যু বনহুরের চিঠি দেখছি।

বললেন মিঃ হাসান— হাঁ স্যার দস্যু বনহুরেরই এই কীর্তি।

মিঃ ইয়াসিন অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—দস্যু বনহুর।

মিঃ আরিফ চৌধুরী তখন চিঠিখানা পড়তে শুরু করেছেন ঃ

মওলানা মাশহাদীকে হত্যা করে আমি অসাধু ব্যবসায়ীগণকে সাবধান করে দিচ্ছি। অর্থের লোভে যারা দেশের জনগণকে ধোঁকা দিয়ে

খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে জনগণের সর্বনাশ করবেন, তাদের আমি ক্ষমা করবো না। যেমন করিনি মওলানা মাশহাদীকে।

—দস্যু বনহুর

একবার নয়, তিন-চারবার চিঠিখানা পড়লেন তিনি স্পষ্টকণ্ঠে। মিঃ আরিফ মিঃ লাউলং সাহেবকে চিঠিখানা পড়ে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিলেন।

মওলানা মাশহাদীর বিকৃত লাশের দিকে তাকিয়ে সবাই শুধু বিস্ময়ে স্তব্ধ হননি, দস্যু বনহুর কিভাবে শাস্তি দিয়ে মওলানা সাহেবকে হত্যা করেছে দেখে সবাই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছেন।

সবাই বুঝতে পারেন মওলানা মাশহাদীর ব্যবসা কতখানি অসৎ জঘন্য ছিলো। তাঁর তেল কারখানা এবং তেলের গুদাম ভস্মীভূত হবার পিছনে কার অদৃশ্য ইঙ্গিত ছিলো, এবার সব স্পষ্ট হয়ে যায় সবার কাছে।

মওলানা মাশহাদীর লাশ কিভাবে তাঁর শয়নকক্ষে এলো, এটাও কম বিস্ময়কর নয়। পুলিশ অফিসারগণ একেবারে থ' হয়ে গেলেন যেন। অনেক চেষ্টা করেও তার কোনো সঠিক সন্ধান জানতে পারলেন না।

মিঃ আরিফ চৌধুরী মওলানা মাশহাদীর লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ অফিসে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন মিঃ লাউলং, মিঃ হাসান এবং মিঃ ইয়াসিন।

পুলিশ অফিসে গোলাকার হয়ে বসে এই রহস্যময় হত্যা এবং মওলানা মাশহাদীর ব্যবসা নিয়ে নানারকম আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো।

একসময় মিঃ ইয়াসিন মিঃ আরিফকে লক্ষ্য করে বললেন—স্যার, একটা কথা আমি জানতে পারিনি এখনও?

বলুন?

যে চুরুটটি আপনি মাশহাদীর টেবিলে পেয়েছিলেন সেটা পরীক্ষা করে কি জানা গিয়েছিলো?

ও, হাঁ, আপনাকে সে কথা বলা হয়নি মিঃ ইয়াসিন। সেই চুরুট পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিলো, চুরুটের মশলার সঙ্গে নেশাযুক্ত এমন একটা

ওষুধ মেশানো হয়েছিলো যা পান করে মওলানা মাশহাদী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মিঃ আরিফের কথা শেষ হতে না হতে একজন পুলিশ ব্যস্ত হয়ে অফিসরুমে প্রবেশ করে সেলাম জানায়, তারপর বলে উঠে —স্যার, গুলবাগ পার্ক রোডের প্যাশে মিঃ হুদা সাহেবের মৃতদেহ পাওয়া গেছে......এক নিশ্বাসে কথাটা বলে হাঁপাতে থাকে পুলিশটি।

মিঃ আরিফ এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার সবাই সবাই একসঙ্গে বলে উঠেন— মিঃ হুদা সাহেবের লাশ?

হাঁ স্যার, আমি এইমাত্র গুলবাগ পার্ক রোড থেকেই আসছি। এক্ষুণি আপনাদের যেতে হবে সেখানে।

অন্যান্য অফিসার সবাই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। মিঃ আরিফ বলে উঠলেন— চলুন দেখা যাক্ কি ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ অফিসারগণ সবাই গাড়ি নিয়ে ছুটলেন গুলবাগ পার্ক রোডের উদ্দেশ্যে।

সবাই পৌঁছে দেখলেন সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। গুলবাগ পার্ক কান্দাই শহরের সুন্দর এক নামকরা পার্ক। এই পার্কের সম্মুখে রোডের পাশে একটি বাক্সের মধ্যে মিঃ হুদার লাশ শায়িত রয়েছে।

জায়গাটা লোকের ভিড়ে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে।

মিঃ আরিফ এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার এগুতেই পুলিশরা ভিড় সরিয়ে দিলো।

মিঃ আরিফ, মিঃ লাউলং, মিঃ ইয়াসিন এবং মিঃ হাসান এসে দাঁড়ালেন বাক্সটার পাশে। বাক্সটা বড় কাঠের বাক্স, ঠিক কতকটা শবাধারের মত দেখতে।

মিঃ আরিফ বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

দু'জন পুলিশ বাক্সটার ঢাকনা খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠেন মিঃ আরিফ চৌধুরী— উঃ কি ভয়ানক হত্যাকান্ড।

মিঃ ইয়াসিন ঝুঁকে বাক্সটার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই মুখখানা বিকৃত করে ফেললেন, কি ভয়ানক বীভৎস দৃশ্য। দেখলেন মিঃ হুদার সরকারি পোশাকটা জমাট রক্তে কালো হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পাশের বুকের কাছে জামার কিছু অংশ ছিদ্র হয়ে রক্ত চাপ হয়ে শুকিয়ে আছে। মুখখানা কিঞ্চিৎ ফাঁকা, চোখ দুটো উর্ধ্বমুখে মেলিত। বাক্সটা খোলার সঙ্গে কতকগুলো মাছি বাক্সে প্রবেশ করে মিঃ হুদার মুখ গহবরে প্রবেশ করতে লাগলো। একটা পঁচা গন্ধ স্থানটাকে বিষাক্ত করে তুলেছিলো। মিঃ ইয়াসিন নাকে রুমাল চাপ দিতে বাধ্য হলেন।

মিঃ আরিফ এবং অন্যান্য সকলেও নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য লাশটার এত সহজে পঁচন ধরতো না যদি বাক্সে হাওয়া প্রবেশের পথ থাকতো।

বাক্সে থাকায় মিঃ হুদার লাশ পঁচে গন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং লাশটি ফুলে উঠেছিলো।

মিঃ আরিফ ঝুঁকে কিছু একটা তুলে নিলেন বাক্স হতে। সবাই অবাক হয়ে দেখলেন, মিঃ আরিফের হাতে একখানা ভাঁজ করা কাগজ।

মিঃ ইয়াসিন বললেন— ওটা কি স্যার?

মিঃ আরিফ ভাঁজ করা কাগজখানা মেলে ধরে বললেন— একখানা চিঠি। নিচের নাম দেখে নিয়ে বললেন আবার—দস্যু বনহুর লিখেছে।

দস্যু বনহুর?

হাঁ। আমি পড়ছি শুনুন। মিঃ আরিফ চৌধুরী পড়তে শুরু করলেন—

দেশের নিপীড়িত জনগণের রক্ষক হলেন পুলিশ মহল।
রক্ষক হয়ে যদি ভক্ষক হয় তবে জনগণ কার কাছে আশ্রয়
নেবে, কার পাশে এসে দাঁড়াবে ভরসা নিয়ে? জনগণের
রক্ত শুষে নিয়ে যারা দেশের দুশমনকে প্রশ্রয় দেয়
তাদের জন্য এই চরম শাস্তি। ঘুষ খোর যারা তাদের
আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

—দস্যু বনহুর।

মিঃ ইয়াসিন হঠাৎ বলে উঠলেন সমুচিত শাস্তিই দরকার ঘুষখোর নরপিশাচ অফিসার যারা আছেন তাদের জন্য ....

মিঃ আরিফ তাকালেন মিঃ ইয়াসিনের মুখে—কি বললেন?

না স্যার, কিছু না। তবে হাঁ, আমার সন্দেহ ছিলো মিঃ হুদা অত্যন্ত ঘুষ খেতেন।

মিঃ আরিফ বললেন— এইসব অফিসারই পুলিশ মহলের কলঙ্ক।

মিঃ ইয়াসিন বললেন আবার— পুলিশ মহল হলো দেশের জনগণের সেবক। তারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উপকার করে যাবেন, তা নয়— তারাই অন্যায়-অনাচার করে চলেছেন। দেখুন স্যার, আজকাল ছোটখাটো অফিসারগণ দেশের জনগণকে এইসব ঘুষের মাধ্যমে নাজেহাল পেরেশান করে চলেছে....

মিঃ আরিফ বললেন— সে সব কথা পরে ভেবে দেখা যাবে, এবার মিঃ হুদার লাশ পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

ঠিক সেই মুহূর্তে গুলবাগ পার্কের হেড মালি ছুটে এলো, রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। চোখেমুখে তার ভীতির ভাব ফুটে উঠছে, ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ালো সে পুলিশ অফিসারদের সম্মুখে—হুজুর লাশ...হুজুর লাশ...অনেক লাশ...

মিঃ হাসান বলে উঠেন— লাশ? কোথায় অনেক লাশ?

হুজুর পার্কের মধ্যে...

মিঃ আরিফের দিকে তাকালেন মিঃ হাসান।

প্রত্যেক পুলিশ অফিসার একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন। বললেন মিঃ ইয়াসিন— চলুন স্যার, দেখা যাক কি ব্যাপার?

সবাই এগুলেন গুলবাগ পার্কের মধ্যে।

আগে আগে চললো পার্কের হেড মালি।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে কতকগুলো ফুলগাছের ঘন ঝাড়। সেই ঝাড়ের আড়ালে আসতেই সকলে যেন হতভম্ভ হয়ে পড়লেন। তাঁরা দেখলেন পাশাপাশি কয়েকটা মৃতদেহ শায়িত রয়েছে। প্রথম নজর পড়তেই তাঁরা চিনলেন মিঃ কাইয়ুমকে। তাঁর দেহে স্যুট শোভা পাচ্ছে। তাঁর পাশে আরও কয়েকটি মৃতদেহ লম্বালম্বি সুন্দরভাবে গুছিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

পুলিশ অফিসারগণ মৃত দেহগুলো সনাক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা সবাই বিস্ময়ে থ' মেরে গেলেন, দেখলেন মিঃ কাইয়ুম সহ প্রত্যেকের হাতের তালুতে একইভাবে অগ্নিদগ্ধ শলাকা প্রবেশের চিহ্ন বিদ্যমান।

মিঃ আরিফ প্রত্যেকটা লাশ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন, মওলানা মাশহাদীর তেল কোম্পানীর ম্যানেজারের হাতের তালুতে কোনো ক্ষত নেই।

মিঃ হাসান বললেন— স্যার, দেখুন প্রত্যেকটি লাশের দক্ষিণ বাজুর জামার সঙ্গে ছোট্ট একটুকরা কাগজ আটকানো রয়েছে মনে হচ্ছে।

মিঃ আরিফ এবং অন্যান্য অফিসার দেখলেন, সত্যি লাশ গুলোর দক্ষিণ বাজুর সঙ্গে এক একটা কাগজের টুকরা আটকানো।

মিঃ হাসান খুলে নিলেন কাগজের টুকরাগুলো। মিঃ কাইয়ুমের বাজু হতে কাগজের টুকরাটা মিঃ আরিফ হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

দুর্নীতি দমন করতে গিয়ে নিজেরাই যারা দুর্নীতির মহারাজ বনে যান তাঁদের জন্য এই পুরস্কার।

—দস্যু বনহুর

দ্বিতীয় চিঠিখানা এবার হাতে নিলেন মিঃ আরিফ। তাতে লেখা আছে—

অসৎ ব্যবসায়ী যারা তাদের আমি এই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

—দস্যু বনহুর

তৃতীয় চিঠিখানা পড়লেন তিনি—

অর্থের পিপাসায় যারা আত্মহারা হয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাদের জন্য এই পুরস্কার।

—দস্যু বনহুর

চতুর্থ চিঠিখানা পড়তে শুরু করলেন—

সাবধান বাণী যে অমান্য করে তাকে আমি শাস্তি এই দিয়ে থাকি।

—দস্যু বনহুর

মিঃ হাসান আর একখানা চিঠি মিঃ আরিফ চৌধুরীর হাতে দিলেন— স্যার, এটা ম্যানেজারের জামার হাতলে ছিলো।

মিঃ আরিফ চিঠিখানা হাতে নিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে পড়তে লাগলেন।

অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট থাকে তাদেরকেও আমি ক্ষমা করি না।

—দস্যু বনহুর।

চিঠিগুলো-পড়া শেষ করে বললেন মিঃ আরিফ— দস্যু বনহুর দেখছি চরমভাবে তার কাজ শুরু করেছে।

মিঃ লাউলং বললেন— এত বেশি প্রশ্রয় সে পেয়েছে যার জন্য সে পুলিশ অফিসারের উপরও জঘন্য আচরণ শুরু করেছে। যেমন করে হোক তাকে গ্রেপ্তারের জন্য আমাদের কৌশল অবলম্বন করতেই হবে। মিঃ কাইয়ূম এবং মিঃ হুদাকে হত্যার জন্য তাকে সমুচিত শাস্তি দান করতে হবে।

মিঃ হাসান বললেন— এতগুলো হত্যা সে একসঙ্গে করেছে এর জন্য তাকে কিছুতেই রেহাই দেওয়া যায় না।

মিঃ ইয়াসিন বললেন— তাকে গ্রেপ্তার করাটাই দুরূপ ব্যাপার। মিঃ জাফরী তাকে বহুবার নাগালের মধ্যে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হননি।

মিঃ আরিফ বললেন— মিঃ জাফরী যা করতে সক্ষম হননি তা আমাদের সমাধা করতে হবে। দস্যু বনহুরকে আর কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

মিঃ লাউলং বললেন এবার— এই সময় মিঃ জাফরীকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হসপিটালে যাওয়ায় দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে আমাদের অনেক অসুবিধা পোয়াতে হবে।

মিঃ আরিফ বললেন— ঠিকই বলেছেন, মিঃ জাফরী ছাড়া দস্যু বনহুরকে সনাক্ত করা সহজ হবে না আমাদের পক্ষে। কারণ, আমরা কেউ দস্যু বনহুরের আসল রূপের সঙ্গে পরিচিত নই।

মিঃ ইয়াসিন দস্যু বনহুরকে প্রকাশ্য দেখেছেন, তার সঙ্গে অনেকবার কথাবার্তাও হয়েছে, তবু তিনি চেপে গেলেন। নীরবে শুনতে লাগলেন অন্যান্য অফিসারের আলাপ-আলোচনা মিঃ ইয়াসিন পুলিশের চাকরি করলেও তিনি দস্যু বনহুরকে মনে মনে সমীহ করেন। তিনি জানেন, দস্যু বনহুর যা করে তা পুলিশ মহলের চোখে এবং দেশের ধনকুবেরদের কাছে দোষণীয় হলেও অন্যায় সে করে না। অন্যায়েরই গলা টিপে সে হত্যা করে।

একসঙ্গে এতগুলো লাশ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অল্পক্ষণে গুলবাগ পার্কের চারিদিক লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। পুলিশের বিপুল বাধা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক জনতা পার্কের ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো।

বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার ভিড় জমালো আশেপাশে।

মিঃ আরিফ এবং পুলিশ অফিসারগণ ডায়রী করে নিলেন, তারপর লাশগুলো পুলিশ অফিসে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়ে তাঁরা গাড়িতে চেপে বসলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের কথা বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেলো। নিহত মওলানা মাশহাদী এবং অন্যান্য নিহত ব্যক্তির ফটো বের হলো বিভিন্ন আকারে। মৃতদেহের সঙ্গে পাওয়া দস্যু বনহুরের চিঠিগুলোও প্রকাশ করা হয়েছে।

এসব পত্রিকা পাঠ করে দেশের জনগণ বিস্মিত হলো। শুধু বিস্মিতই হলো না, তাদের মধ্যে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

কান্দাই-এর পথেঘাটে, দোকানে, হোটেলে, সিনেমা হলে, সর্বত্র ঐ এক কথা। সকলের হাতে হাতে পত্রিকা, সবার মুখে মুখে একই আলোচনা। মওলানা মাশহাদী এবং তাঁর ব্যবসায় অংশীদারগণও পুলিশ অফিসারদের নিহত ব্যাপার নিয়ে মহা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

অসৎ উপায়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তাদের হৃৎপিন্ড ধক্‌ধক্‌ করে উঠলো, শিউরে উঠলো তাদের শিরা-উপশিরাগুলো। প্রতি মুহূর্তে বনহুরের আগমন আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন রইলো তারা।

যেসব পুলিশ অফিসার এবং বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীগণ যারা অবিরত জনগণের নিকট হতে ঘুষ খেয়ে থাকে তাদের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়লো, প্রতি মুহূর্তে তারা মৃত্যুর জন্য কুঁকড়ে পড়লো। না জানি কখন কোন দণ্ডে দস্যু বনহুর আজরাইলের বেশে এসে হাজির হবে, ঠিক নেই।

শহরে সবাই আতঙ্ক নিয়ে চলাফেরা করতে লাগলো। একসঙ্গে এতগুলো হত্যাকান্ড কম কথা নয়। যারা অসৎ ব্যবসায় লিপ্ত ছিলো তারা তাদের ব্যবসার মোড় ঘুরিয়ে দিলো। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো হতে ক্ষান্ত হলো তারা। তবুও নিশ্চিন্ত নয় এইসব ব্যক্তি, কারণ তাদের অপরাধের বোঝা কম নয়।

যারা ঘুষখোর অফিসার তারা নিজেদের সংযত করে নিলেন। অর্থ দেখে ভরে শিউরে উঠেন তারা, এই অর্তের লোভেই সেই নির্মম মৃত্যু ঘটেছে। দস্যু বনহুর উচিত সাজা দিয়ে দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়েছে।

❑

সমস্ত কান্দাই শহরে যখন দস্যু বনহুর এবং তার এই অদ্ভুত হত্যাব্যাপার নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, তখন চৌধুরী বাড়ির মনিরা ও মরিয়ম বেগম এইসব পত্রিকা নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে দেখছে।

মনিরা পত্রিকাখানা মরিয়ম বেগমের সম্মুখে মেলে ধরে ক্রুদ্ধভাবে বললো— দেখো মামী মা তোমার গুণবীর পুত্রের কার্যকলাপ দেখো, সে কি মানুষ, না হৃদয়হীন নরপিশাচ......

মরিয়ম বেগম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— ও কথা বলিসনে মা। আমার বুকটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমার মনির কিছুতেই এমনভাবে হত্যা করতে পারে না।

এই দেখো, পড়ে দেখো সব। কতগুলো হত্যাকান্ড সে নিমর্মভাবে করেছে।

নিয়ে যা, আমি ওসব দেখতে চাই না মনিরা। আমার মনির কিছুতে এ হত্যা করেনি।

হঠাৎ পিছনে গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর—হাঁ, তোমার মনিরই এ হত্যা করেছে মা।

কে—কে, মনির তুই।

হাঁ মা, তোমার মনির।

মনির এবং মরিয়ম বেগম নির্জন কক্ষে বসে এইসব আলাপ-আলোচনা হচ্ছিলো। রাত তখন গভীর।

পাশের ঘরে নূর ঘুমাচ্ছে।

মরিয়ম বেগম এশার নামাজ শেষ করে যখন মোনাজাত করছিলো তখন মনিরা পত্রিকাগুলো হাতে নিয়ে শাশুড়ীর নামাজ কক্ষে প্রবেশ করেছিলো এবং প্রশ্ন করেছিলো তাঁর পুত্রের আচরণ সম্বন্ধে। স্বামীর প্রতি একটা রাগ-অভিমান তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো তাই মনিরা পুত্রের কর্মের কৈফিয়ত তলব করতে এসেছিলো তার জননীর কাছে।

বনহুর হেসে এগিয়ে এলো, মা এবং স্ত্রীর মাঝখানে এক পাশে বসে পড়লো।

মরিয়ম বেগম বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন— এসব হত্যা তুই করেছিস্ মনির?

হাঁ মা।

মরিয়ম বেগম পুত্রের জামার অংশ চেপে ধরলেন— তুই মানুষ না পশু?

তোমার ছেলে পশু নয় মা, মানুষ— মানুষ বলেই সে অমানুষিক কাজ সহ্য করতে পারে না। মা, যাদের আমি হত্যা করেছি তারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, জনগণের শত্রু......শুধু এদের হত্যা করেই আমি ক্ষান্ত হইনি, প্রয়োজন হলে আমাকে আরও বহু হত্যা করতে হবে।

মনির। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেন মরিয়ম বেগম।

তোমার ছেলে আজ মনির চৌধুরী কিন্তু যখন সে হত্যার নেশায় মেতে উঠে তখন সে মনির চৌধুরী থাকে না। সে তখন হৃদয়হীন নরপিশাচ রূপ ধারণ করে......কথাগুলো রাগতভাবে বললো মনিরা।

বনহুর ভ্রু বাঁকা করে মৃদু হেসে তাকালো মনিরার মুখের দিকে।

মনিরা উঠে চলে গেলো দ্রুত তার নিজের কক্ষে।

বনহুর মায়ের হাত দু'খানা চেপে ধরলো হাতের মুঠায়, মিনতিভরা করুণ কণ্ঠে বললো—মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মা। তোমার ছেলে হৃদয়হীন নরপিশাচ নয়, কিন্তু... ... বনহুর থামলো। ধীরে ধীরে তার মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, হয়তো দেশের শয়তান-দুশমন যারা তাদের কথা মনে উদয় হলো, দাঁতে দাঁত পিষে বললো— কিন্তু তোমার ছেলে সেই মুহূর্তে নিজকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারে না যখন দেশের শত্রুর সম্মুখে সে হাজির হয়।

মরিয়ম বেগম পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে। একটা অদ্ভুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় বনহুরের মুখে। কিছু পূর্বের মনির যেন পাল্টে যায় মুহূর্তে।

বনহুর নিজকে সংযত করে নেয়, বলে— মা, আমাকে ক্ষমা করো?

ওরে তুই আমার জীবনের সম্বল, তোকে আমি ক্ষমা না করে পারি। হাঁ বাবা, মনিরা তোর উপর অভিমান করেছে।

বনহুর একটু হেসে মায়ের মুখে তাকিয়ে যে পথে মনিরা কক্ষ ত্যাগ করেছিলো সেই পথে চলে যায়।

মরিয়ম বেগম দু'হাত তুলে ধরেন উপরের দিকে— হে খোদা, তুমি আমার মনিরকে সুমতি দাও। ওকে তুমি সুপথে চালাও প্রভু... ... ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর গণ্ড বেয়ে।

❑

মনিরা বালিশে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলো।

বনহুর এসে পাশে বসে পিঠে হাত রাখে, ডাকে সে— মনিরা।

কোনো জবাব না দিয়ে মনিরা উচ্ছসিতভাবে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বনহুর মনিরাকে তুলে নেয়, বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে— ছিঃ ওভাবে কাঁদতে আছে। কি অপরাধ আমি করেছি তোমার কাছে বলো?

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে— আমার স্বামী হয়ে তুমি নরঘাতক, তুমি নরপিশাচ।

বলো. আরও বলো মনিরা?

তোমাকে আমি হত্যা করবো, দেবো না আর আমি তোমাকে হত্যা করতে।

হেসে বললো বনহুর— বেশ তো তাই করো, তোমার সামনে বান্দা হাজির রয়েছে।

মনিরা স্বামীর মুখে তাকালো, স্বামীর হাস্যোজ্জল সুন্দর মুখখানা তাকে আত্নহারা করে ফেললো। এই মুহূর্তে বনহুরকে দেখলে কেউ ভাবতেও পারবে না সে কোনো সময় লৌহমানবের মত কঠিন হতে পারে।

মনিরা ভুলে গেলো সব, স্বামীর বুকে মাথা রাখলো।

বনহুর নিজের হাতে মনিরার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো —কেন আমি এদের হত্যা করেছি যদি ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে.মনিরা তাহলে তুমি আমার উপর রাগান্বিত হতে পারতে না। যাদের আমি হত্যা করেছি তাদের অপরাধ সীমাহীন।

কি ক্ষতি তারা তোমার করেছিলো?

আমার ক্ষতি যারা করে তাদের আমি পূজা করি— মনিরা। কিন্তু দেশের যারা ক্ষতি করে, দেশের জনগণের যারা সর্বনাশ করে তাদের আমি ক্ষমা করি না। কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে বনহুর।

মনিরা এরপর স্বামীকে এ ব্যাপারে আর কিছু বলতে সাহসী হলো না।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বললো— আর কিছু বলব না তোমাকে। না জেনে আমি তোমার কাজে ক্রুদ্ধ হই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

বনহুর মনিরার মাথায়-পিঠে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে বলে —শুধু তুমি নও, মাও আমার কাজে সন্তুষ্ট নন মনিরা। কেউ আমার কাজে সন্তুষ্ট নয়, তবু আমি আমার কাজ করে চলেছি। যাক ও সব কথা। মনিরা?

বলো?

একটা কথা বলবো বলে এসেছি।

বলো?

ভূমিকা না করেই বলছি।

তাই বলো?

অনেকদিন আগে একটি মেয়ে আমার শহরের আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিলো। তার কেউ না থাকায় তাকে কোথাও পৌঁছে দিতে পারিনি।

তাই তুমি কি বলতে চাও? মনিরার কথার স্বর কেমন যেন ভারী মনে হলো।

বনহুর বললো— ওর বয়স হয়েছে, আর কতদিন এমনিভাবে রাখা যায়, তাই......

বলো কি বলতে চাও?

মেয়েটি কিন্তু খুব সুন্দরী...

এসব আমাকে শোনাচ্ছো কেন? যাও তাকে নিয়েই থাকবে, যাও। মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

বনহুর বলে আবার—আগে সব শোন, তারপর যা হয় করো। মেয়েটির বিয়ে হওয়া একান্ত দরকার। সে আমাকে বড় ভাই বলে জানে, আমি তাকে বোনের মত স্নেহ করি।

এবার মনিরা চোখ তুলে—তা আমাকে কি করতে বলো।

একটা ভাল পাত্র খুঁজে দাও মনিরা।

কেন, তুমি পারো না? কত লোক তোমার অংগুলি হেলনে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে, আর একটি সৎপাত্র পাও না?

তুমি তো জানো মনিরা, সভ্য সমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতখানি। কাজেই তোমার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখলাম না। ওর নাম মাহমুদা—মাহমুদার জন্য একটি পাত্র খুঁজে দাও।

বলো তোমার বোনের জন্য কেমন পাত্রের প্রয়োজন?

মাহমুদা শুধু আমার বোন নয়, তোমারও বোন। তোমার যেমন পছন্দ তেমনি একটি ছেলে দেখবে ওর জন্য।

বেশ, তোমার বোনটিকে আমার দেখা দরকার তো?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই মাহমুদাকে এনে দেবো তোমার কাছে, এখানেই ওকে রাখবে।

আচ্ছা, তাই হবে। আমার এক বান্ধবীর ভাই আছেন—উচ্চশিক্ষিত, অল্পদিন হলো বিদেশ থেকে ডক্টরেট নিয়ে ফিরেছেন, একটা সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের খোঁজ করছেন তিনি।

বনহুর বললো—দেখো মনিরা, মাহমুদার আজ কেউ না থাকলেও তার বংশমর্যাদা কম নয়। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সে। কাজেই কোনো অসুবিধা নেই বুঝলে?

বুঝেছি। এবার বলো, তোমার বোন না আমার বোন বলে চালিয়ে নেবো?

তোমার বোনই বলো মনিরা, সেটাই মানাবে ভালো, বলো দেশের বাড়ির চাচার মেয়ে বা খালার মেয়ে।

অত শিখিয়ে দিতে হবে না তোমাকে। যা হয় আমিই বলবো।

আমাকে বাঁচালে মনিরা।

❑

পুলিশ মহল দস্যু বনহুরের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগে গেলো। চারিদিকে পুলিশ-ফোর্স ছুটাছুটি করে ফিরছে। গোয়েন্দা বিভাগ ছদ্মবেশে এখানে-সেখানে আত্মগোপন করে অনুসন্ধান করে চলেছে। এবার পুলিশ মহল দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে।

শুধু কান্দাই শহর নয়, আশে পাশের দেশগুলোতেও দস্যু বনহুরকে নিয়ে ভীষণ আলোড়ন শুরু হয়েছে।

এদিকে দেশের জনগণের মধ্যে বিপুল একটা আনন্দোচ্ছ্বাস জলস্রোতের মত বয়ে চলেছে। দেশের অসৎ ব্যবসায়ী এবং ঘুষখোর যারা, তাদের মুখ চুন হয়ে গেছে। কেউ কোনো কুকর্ম করতে সাহসী হচ্ছে না।

মওলানা মাশহাদীর একটি তেলবাহী জাহাজ পাকিস্তান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো। সেই জাহাজখানাও সমূদ্র গর্ভে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে পাঁচ লক্ষ মণ তেল ছিলো। কে বা কারা জাহাজখানাকে

সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত করেছে, পুলিশ মহল অনুসন্ধান করেও জানতে পারেনি—আন্দাজেই ধরে নিয়েছে দস্যু বনহুরের কাজ এটা।

আরও যে সব কল-কারখানা থেকে ভেজাল মেশানো খাদ্যদ্রব্য তৈরি হতো, সব কলকারখানা জ্বলে উঠলো। মওলানা মাশহাদীর হত্যা এবং তাঁর তেল কারখানা বিনিষ্ট হওয়ার পরও সব অসৎ ব্যবসায়ী দুঃসাহসিকতার সঙ্গে গোপনে তাদের কু'ব্যবসা চালিয়ে যেতে সাহসী হয়েছিলো তাদেরও ক্ষমা করলো না বনহুর।

উন্মাদ হয়ে উঠেছে যেন দস্যু বনহুর। কোনো বাধাবিঘ্ন তাকে ক্ষান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। পুলিশ মহল বা দুর্নীতি দমন বিভাগ এতদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাদের শায়েস্তা করতে পারেনি, দস্যু বনহুর তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সেদিন ইউসুফ আলী কোরেশী—ঔষধু কারখানার মালিক তার ব্যবসা গুটিয়ে দেশত্যাগ উদ্দেশ্যে গোপন শলা-পরামর্শ করছিলো। কারণ, তার ব্যবসা ছিলো অত্যন্ত অসৎ এবং জঘন্যতর। ইউসুফ আলী তার ঔষুধের ব্যবসায় অসাধু উপায়ে বহু অর্থ উপার্জন করেছেন। কান্দাই শহরে যখন দস্যু বনহুরের নির্মম হত্যালীলা চলেছে তখন ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো ইউসুফ আলী। সে জানতো দস্যু বনহুরের কোপদৃষ্টি থেকে তার পরিত্রাণ নেই।

ইউসুফ আলী তাই ভীত হয়ে পড়েছিলো, গোপনে সরে পড়ার আয়োজন করছিলো সে কারখানা আপাততঃ বন্ধ রেখে। টাকা-পয়সাসহ পালাবে-এই ছিলো তার মনের বাসনা।

গভীর রাত।

ইউসুফ আলী তার শয়নকক্ষে ম্যানেজারের সহিত গোপনে আলাপ আলোচনা করছিলো। ভোর রাতে যে বোয়িং প্লেনখানা কান্দাই ঘাটি ত্যাগ করবে তাতেই তারা সরে পড়বে, সেইমত ব্যবস্থা নিয়েছে তারা।

সম্মুখের সুটকেসে লক্ষ লক্ষ টাকার বান্ডিলগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মূল্যবান স্বর্ণ অলঙ্কারে আরও একটি ব্যাগ পূর্ণ।

চারিদিকে দরজা বন্ধ।

কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই।

ইউসুফ আলী কোরেশী ওভারকোট পরে নিয়েছে, মাথায় ক্যাপ। পকেটে গুলীভরা রিভলভার। পায়ে ভারী বুট।

উঠে দাঁড়ালো ইউসুফ আলী, পালাবে এবার সে।

ম্যানেজারের হাতে চাবির গোছা দিয়ে বললো—আপনি সব দেখেশুনে চালিয়ে নেবেন।

আর আপনি কবে ফিরবেন স্যার?

যতদিন কান্দাই শহর থেকে দস্যু বনহুরের অস্তিত্ব মুছে না যাবে।

ইউসুফ আলীর কথা শেষ হয় না, পিছন থেকে এগিয়ে আসে একটি ছায়ামূর্তি।

চমকে উঠে ইউসুফ আলী ও তার বিশ্বস্ত ম্যানেজার।

ইউসুফ আলী কোরেশী দ্রুত ওভারকোটের পকেটে হাত ভরতে যায় কিন্তু পারে না।

ছায়ামূর্তি গর্জে উঠে—খবরদার, পকেটে হাত দিতে চেষ্টা করবেন না।

ইউসুফ আলী হাত দু'খানা তুলে ধরতে বাধ্য হলো।

ম্যানেজার তো ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিলো, হাত দু'খানা সে তুলে ধরেছিলো প্রথমেই। কারণ, ছায়ামূর্তির হস্তের চকচকে কালো রিভলভারখানা তার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিলো।

ইউসুফ আলী কোরেশী হাত তুলতে বাধ্য হলো বটে, কিন্তু সে পালাবার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। তবু সাহস করে বললো—কে তুমি দস্যু বনহুর?

চিনে নিতে পেরেছো তাহলে? তাছাড়া তুমি জানতে আমি আসতে পারি।

ইউসুফ অবশ্য আন্দাজে ধরে নিয়েছিলো ছায়ামূর্তি দস্যু বনহুর হতে পারে। কিন্তু সে আশা করতে পারেনি, দস্যু বনহুর তার বন্ধ কক্ষে প্রবেশে সক্ষম হবে। দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে ইউসুফ আলী কোরেশীর।

দস্যু বনহুর এগিয়ে আসে আরও দু'পা।

ইউসুফ আলী কোরেশীর হৃৎপিন্ড ধক্ ধক্ করে উঠে, ঢোক গিলে বলে—আমার এ বন্ধ কক্ষে তুমি কিভাবে প্রবেশ করলে?

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বনহুর, তারপর বলে—এইটুকু জানেন না কোরেশী সাহেব দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। আপনি ভূগর্ভে বসে যদি অসৎ কাজ করে যান তবু আমার কাছে আত্মগোপন করতে পারবেন না। মাটি খুঁড়ে আমি সেখানে হাজির হবো। এবার বুঝতে পেরেছেন এখানে কেমন করে এসেছি।

কি চাও তুমি আমার কাছে?

এতদিন আপনি যে মহৎ এবং সৎ কাজ করেছেন তার পুরস্কার দিতে এসেছি। ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে আপনি কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন, আর সেই ওষুধ ব্যবহার করে অকালে প্রাণ দিয়েছে কোটি কোটি মানুষ। দেখুন এমন মহান ব্যক্তি আপনি কাজেই হঠাৎ থেমে যায় বনহুর। ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে বলে—আপনার বিচার আজ স্থগিত রইলো। আপনি বেরিয়ে যান এবং শীঘ্র পুলিশে সংবাদ দিন। যান যান বলছি--

ম্যানেজার ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে দস্যু বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো, কথাগুলো তার কানে পৌঁছছিলো কিনা সন্দেহ। কেমন যেন হাবা বনে গেছে ম্যানেজার ভদ্রলোক। দস্যু বনহুর তাকে বেরিয়ে যেতে বলছে এবং পুলিশে সংবাদ দিতে বলছে, এ যেন কেমন অবিশ্বাস্য কথা।

বনহুর পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বলে—হা করে কি দেখছেন? যান পুলিশ অফিসে ফোন করুন যে, দস্যু বনহুর আপনার মালিককে পুরস্কার দেবার জন্য হাজির হয়েছে--যান এবার।

ম্যানেজার ভদ্রলোক মরি-বাঁচি করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। একবার ফিরে তাকাতেও সাহসী হলো না সে।

ম্যানেজার ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই বনহুর ইউসুফ আলী কোরেশীর বুকে চেপে ধরলো রিভলভার কিন্তু গুলী না ছুঁড়ে বাম হাতে নিজ কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা একটানে খুলে নিয়ে বসিয়ে দিলো সে ইউসুফ আলীর তলপেটে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো ইউসুফ আলী কোরেশী।

বনহুর ইউসুফ আলীর দেহটা ধরে ফেললো দু'হাতের উপর তারপর শুইয়ে দিলো বিছানায়।

❑

মিঃ আরিফ চৌধুরীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

মিসেস আরিফ বলছেন—ওগো শুনছো, তোমার ফোন--

এ্যাঁ কি বললে ফোন?

হাঁ, দেখো কে ফোন করেছে।

মিঃ আরিফ বিছানা থেকে ঝুঁকে টেবিল থেকে রিসিভারখানা হাতে তুলে নিয়েই বললেন—কে বলছেন? মিঃ হারুন? কি বললেন—ইউসুফ ভিলা থেকে কেউ ফোন করেছে?

ওদিক থেকে ভেসে আসে মিঃ হারুনের কণ্ঠ—হাঁ স্যার ইউসুফ আলীর কক্ষে নাকি দস্যু বনহুর প্রবেশ করেছে--শীঘ্র সেখানে যাবার জন্য পুলিশ অফিসে ফোন করেছেন ইউসুফ আলী কোরেশীর ম্যানেজার.......হ্যালো স্যার, আপনি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে আসুন---

দস্যু বনহুর---আচ্ছা আসছি--আপনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে তৈরি থাকুন--অফিস ইনচার্জে এখন আপনি আর কে আছেন?

স্যার আমি এবং হাওয়ালদার কেরামত মিয়া আছি। কেরামত মিয়া পুলিশ অফিস ইনচার্জে থাকবে, আমি আপনার সঙ্গে ইউসুফ ভিলায় যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি---স্যার, চলে আসুন।

আসছি, আপনি পুলিশ ফোর্স এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি রাখুন, মিঃ আরিফ রিসিভার রেখে দ্রুত শয্যা ত্যাগ করলেন।

মিসেস আরিফ স্বামীকে উঠে পড়তে দেখে তিনিও শয্যা ত্যাগ করেছিলেন, বললেন—দস্যু বনহুর?

হাঁ এক ওষুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতে তার আবির্ভাব ঘটেছে। জামাটা গায়ে পরতে পরতে বললেন মিঃ আরিফ চৌধুরী।

মিসেস আরিফ বললেন আবার—দস্যু বনহুর ওষুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছে, বলো কি?

তাইতো বলছে---

কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করছে।

কোনো ভয় নেই, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার উদ্দ্যেশেই আমি কান্দাই এসেছি, ভয় পেলে চলবে কেন; তুমি থাকো, হাঁ যদি কোনো সংবাদ হয় তোমাকে ফোন করে জানাবো। কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলেন মিঃ আরিফ চৌধুরী।

মিসেস আরিফ অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—খোদা, তুমি ওকে দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা করো।

দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই আর্ত চিৎকার করে উঠেন মিসেস আরিফ, তিনি দেখতে পান—তার কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাক পরা একটি লোক!

মিসেস আরিফকে চিৎকার করতে দেখে হেসে বললো কালো পোশাক পরা লোকটি—ভয় নেই, আমিই দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর----

হাঁ। আপনার স্বামী এখন আমাকে গ্রেপ্তার উদ্দেশ্যে পুলিশ অফিস অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু কোনো ফল হবে না, ইউসুফ আলীকে তার কাজের পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেছে।

মিসেস আরিফ অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন দস্যু বনহুরের দিকে। দস্যু বনহুরের মুখখানা সম্পূর্ণ দেখতে না পেলেও তার চোখ দু'টো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে তার প্রশস্ত ললাটের কিছু অংশ। পাগড়ীর আঁচলে বনহুরের মুখমন্ডলের নীচ অংশ ঢাকা, তবু বেশ বুঝতে পারেন মিসেস আরিফ লোকটি অদ্ভুত সুন্দর। চোখ দুটিতে অপূর্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ভাবেন মিসেস আরিফ, দস্যু বনহুর সেতো ভয়ঙ্কর এক মূর্তি কিন্তু---

মিসেস আরিফের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বলে বনহুর—আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন আমাকে এখানে দেখে, না?

হাঁ, আপনি কি করে এখানে এলেন? বললেন মিসেস আরিফ।

বনহুর হেসে বললো—দস্যু বনহুর যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করতে পারে। আপনাদের পিছন জানালার শার্শী খুলে আমি এসেছি। কিন্তু কেন এসেছি, এবার শুনুন। দেখুন, আমি যা করে চলেছি তা মানুষের কল্যাণ আশায়। দেশের শত্রু বিনাশে আমি উন্মাদ। আপনার স্বামীকে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে সময় নষ্ট না করে দেশের অসৎ অসাধু দুর্নীতিপরায়ণ যাদের জন্য আজ দেশের জনগণ নির্যাতিত নিষ্পেষিত তাদের দমনে আত্মনিয়োগ করতে বলুন। আচ্ছা চলি--বনহুর যে পথে এসেছিলো সেই পথে বেরিয়ে গেলো।

মিসেস আরিফ নির্বাক স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন দস্যু বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে। মনে তার শুধু বিস্ময়ই নয়, একটা প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা—দস্যু বনহুর এসেছিলো তার কক্ষে—পুলিশ সুপার মিঃ আরিফ চৌধুরীর কক্ষে—এ কি করে সম্ভব? যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য সমস্ত পুলিশ বাহিনী অহরহ কান্দাই শহর চষে ফিরছে সেই দস্যু বনহুর এসেছিলো তার সম্মুখে। মিসেস আরিফ কেমন যেন সম্বিৎহারা হয়ে পড়েন, দস্যু বনহুরকে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন—একি সত্যি না স্বপ্ন? নিজের দৃষ্টিকেই মিসেস আরিফ যেন বিশ্বাস করতে পারেন না।

এখানে মিসেস আরিফ যখন দস্যু বনহুর সম্বন্ধে বিষয় নিয়ে ভাবছেন তখন মিঃ আরিফ মিঃ হাসান এবং পুলিশ ফোর্স নিয়ে পৌঁছে গেছেন ইউসুফ ভিলাতে।

মিঃ আরিফ মিঃ হাসান যখন গাড়ি থেকে নামলেন, তখন ম্যানেজার এসে হাইমাই করে কেঁদে উঠলেন স্যার আপনারা আসার পূর্বেই মালিককে খুন করে দস্যু বনহুর উধাও হয়েছে।

কি বললেন জনাব ইউসুফ সাহেব খুন হয়েছে। এক সঙ্গে মিঃ আরিফ এবং মিঃ হাসান উচ্চারণ করলেন।

মিঃ হাসান বললেন—চলুন স্যার, দেখা যাক।

মিঃ আরিফ বললেন—চলুন।

ম্যানেজার রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বললো—সব গেছে স্যার—সব গেছে। এগুলো সে অফিসারদ্বয়ের সঙ্গে।

মিঃ ইউসুফ আলী কোরেশীর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন তাঁরা, মিঃ ইউসুফ আলী তাঁর শয্যায় শায়িত আছেন কিন্তু তাঁর শয্যার উপরে তাজা লাল রক্তের স্রোত বয়ে চলছে। একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে ইউসুফ আলী কোরেশীর তলপেটে।

মিঃ হাসান চোখ ঢেকে ফেললেন—সেকি ভীষৎস হত্যাকান্ড।

মিঃ আরিফ ছোরাখানা তুলে নিলেন হাতে; সঙ্গে সঙ্গে একটি চিঠি দেখলেন চিঠি খানা মেলে ধরতেই তাঁর নজরে পড়লো তাতে লিখা আছে—

"সব চেয়ে বড় অপরাধ ওষুধে ভেজাল মিশানো ইউসুফ আলী কোরেশী ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। আজ তার পুরস্কার পেলেন।"

—দস্যু বনহুর

কিছুক্ষণ থ'হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মিঃ আরিফ, তাঁর চোখেমুখে একটা বিরাট বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এত সাবধানতা, চারিদিকে পুলিশ পাহারা তবু শহরে দস্যু বনহুর সচ্ছন্দে তার কাজ চালিয়ে চলেছে। এবার তিনি বললেন—আশ্চর্য দস্যু বনহুর দেখছি যাদুবিদ্যা জানে।

ম্যানেজার বললেন—স্যার, একেবারে খাঁটি সত্য। দস্যু বনহুর কি করে যে মিঃ কোরেশীর বন্ধ কক্ষে প্রবেশ করলো ভেবে পাচ্ছি না।

ম্যানেজার সাহেব সব কথা বললেন মিঃ আরিফ চৌধুরীর কাছে। কিভাবে দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটেছিলো, কিভাবে সে তাকে বেরিয়ে

যাবার জন্য আদেশ দিয়েছিলো, কিভাবে তাঁকে পুলিশ অফিসে ফোন করার জন্য বলেছিলো—সব খুলে বললেন তিনি।

কিন্তু ইউসুফ আলী কোরেশী যে অজস্র টাকা সুটকেসে নিয়ে পালাচ্ছিলেন, সে কথা ম্যানেজার গোপন করে গেলেন পুলিশের কাছে। সে কথা প্রকাশ করতে গেলে আবার তাকেও পুলিশ দোষী করে বসে কাজেই তিনি গোপন করলো টাকার কথা।

মিঃ আরিফ এবং মিঃ হাসান লাশ পরীক্ষা করে অবাক হলো, কারণ ইউসুফ কোরেশীর দেহে বাইরে যাবার পোশাক কেন? তিনি তো শয্যায় শায়িত রয়েছেন অথচ গায়ে ওভারকোর্ট, মাথায় ক্যাপ, পায়ে ভারী বুট।

মিঃ আরিফ বললেন—ম্যানেজার আপনি ঠিক করে বলুন, আপনার সাহেব কি এত রাতে বাইরে যাচ্ছিলেন কিংবা তিনি গভীর রাতে কোথাও থেকে বাসায় ফিরেছিলেন?

এবার ম্যানেজারের মুখ বিবর্ণ হলো, সে ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেও প্রকাশ হয়ে পড়লো।

কথায় কথায় মিঃ আরিফ আসল ব্যাপারখানা বের করে নিলেন ম্যানেজারের কাছ থেকে। হাজার হলেও অভিজ্ঞ পুলিশ সুপার মিঃ আরিফ চৌধুরী। যদিও তাঁর বয়স খুব বেশি নয়, কিন্তু কার্যদক্ষতায় তিনি পুলিশ মহলে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

ম্যানেজার ভদ্রলোকও শেষ পর্যন্ত আটকে পড়লো পুলিশের হাতে।

ইউসুফ আলী কোরেশীর লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে বাসায় ফিরতে বিলম্ব হয়ে গেলো অনেক আরিফ চৌধুরীর।

ভোর বেলা বাসায় পৌঁছে তিনি যা জানতে পারলেন তাতে শুধু স্তব্ধ হয়েই গেলেন না, একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। চাকরের মুখে শুনে উপরে গেলেন মিঃ আরিফ স্ত্রীকে নিশ্চুপ বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে প্রথমে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর শয্যার পাশে এসে বসলেন। মিঃ আরিফ যেন কেমন হতভম্ভ হয়ে পড়েছেন— তিনি বেশি বিচলিত হয়েছেন দস্যু বনহুর তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেনি তো? তাড়াতাড়ি শয্যার পাশে এসে ঝুঁকে পড়লেন স্ত্রীর মুখে—শামীমা---শামীমা---

মিসেস আরিফ স্বামীকে দেখে উঠে বসলেন।

মিঃ আরিফ ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—কি হয়েছে শামীমা? কি হয়েছে তোমার?

মিসেস আরিফ স্বামীর মুখে দৃষ্টি তুলে ধরে বললেন—দস্যু বনহুর এসেছিলো।

শুনলাম ওদের কাছে। কোনো ক্ষতি করেনি তো সে? মিঃ আরিফের কণ্ঠে একরাশ ব্যস্ততা ঝরে পড়ে।

মিসেস আরিফ বললেন—না।

বাঁচালে! আমাকে বাঁচালে শামীমা। ঐ শয়তান দস্যুটা এখানে কেন এসেছিলো? কোনো অলঙ্কারাদি নিয়ে যায়নি তো? মিঃ আরিফ স্ত্রীর গলায় ও হাতে তাকিয়ে লক্ষ্য করেন।

কারণ মিসেস আরিফের গলায় মূল্যবান হার ও হাতে বালা ছিলো।

মিসেস আরিফ স্বামীর কথায় বললেন—দস্যু বনহুরকে তুমি দেখোনি তাই তার সম্বন্ধে এমন উক্তি করছো? শয়তান সে নয়—শয়তান তোমরা, যারা দেশের সত্যিকারের দুশমনদের প্রশ্রয় দিয়ে দেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছো।

এ তুমি কি বলছো শামীমা? মিঃ আরিফ স্ত্রীর কথায় যেন একেবারে হতবাক হয়ে যান।

মিসেস আরিফ বললেন আবার—দেশ ও দশের যারা সর্বনাশ করে চলেছে তাদের তোমরা কি শাস্তি দিচ্ছো বলো? তোমরা আসল দোষীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হও না, তোমরা শুধু ঘুরে বেড়াও আলেয়ার পিছনে। জানো কত অমানুষ আজ মানুষের মুখোস পরে তোমাদেরই আশেপাশে সাধু সেজে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুযোগ নিয়ে মানুষ হয়ে মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। দিন দিন দেশের জনগণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে—

শামীমা, তুমি কি পাগল হলে?

পাগল হইনি---

দস্যু বনহুর কি তোমার উপর যাদু করে গেছে?

যাদুকর সে নয়, যাদুকর আমাদের দেশের কতকগুলো মানুষ। যারা তোমাদের মানে পুলিশ হর্তাকর্তাদের চোখে ধাধা লাগিয়ে দেয় আর সমাজের চরম সর্বনাশ করে চলেছে। যদি মঙ্গল চাও তবে দস্যু বনহুরের সন্ধান ত্যাগ করে যারা দেশের বিষাক্ত কীট তাদের সন্ধান করো। তাদের খুঁজে বের করে চরম শাস্তি দাও--শুধু তুমি নও সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে

সজাগ করে দাও, দেশের শত্রুদের খুঁজে বের করে চরম শাস্তি দেয়, যে শাস্তির পর আর তারা অসৎ কাজে লিপ্ত হবে না।

শামীমার কথাগুলো মিঃ আরিফের কানে যেন এক একটা বজ্রধ্বনির মত প্রবেশ করতে থাকে। সবগুলো কথা যেন গেঁথে যায় তার মনে। এমন উক্তি শামীমা শিখলো কোথা থেকে— মিঃ আরিফ বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন স্ত্রীর দিকে। এবার মিঃ আরিফ বললেন—দস্যু বনহুর দেখছি তোমার কানে যাদুমন্ত্র দিয়ে গেছে।

ঠাট্টা করো না, আমি যা বলছি শোন।

সব তো শুনলাম।

তবে এখন থেকে সেইভাবে কাজ করবে! তোমরা পুলিশ মহলে এত হর্তাকর্তা থাকতে দেশে এমন অন্যায় অনাচার কি করে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে? আমার মনে হয়, সরকার যদি এদিকে তীক্ষ্ণ নজর দেন, অপরাধিগণকে তাদের সমুচিত শাস্তি দেন, তাহলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে। অন্যায় অসাধু কাজগুলো কমে গেলে দস্যু বনহুরও আর তোমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না---

তুমি পুলিশ সুপারের স্ত্রী হয়ে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে এমন কথা উচ্চারণ করতে তোমার বাধছে না? জানো, এটা তোমার চরম অপরাধ।

তারজন্য তুমি আমাকে হাজতে দিতে পারো, ফাঁসি দিতে পারো—যা খুশি তাই করতে পারো, তবু আমি বলবো, তোমাদের চেয়ে দস্যু বনহুর অনেক বড় অনেক মহৎ। কারণ সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে। তুমি তো জানো দস্যু বনহুর নির্দোষ ব্যক্তির কেশও স্পর্শ করে না।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে কিছু ভাবলেন মিঃ আরিফ তারপর বললেন—শামীমা সব বুঝি, সব জানি কিন্তু আমি চাকরি করি। আমাকে অনেক চিন্তা করে কাজ করতে হয়। দেশের চারিদিকে যে অন্যায় অনাচার দিন দিন বেড়ে চলেছে, তা বুঝেও কিছু করবার তেমন কোনো সুযোগ করে উঠতে পারি না। কারণ দেশের যারা নেতৃস্থানীয় তারাই আজ দেশের সর্বনাশের মূল। অনেক সময় বুঝেও আমাদের না বুঝার ভান করতে হয়। হয়তো আমি জানি, আমার পাশেই বসে আছেন যিনি তিনিই একজন অসৎ অসাধু অন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, কিন্তু তিনি দেশের একজন নেতা। বলো, এমন অবস্থায় আমরা পুলিশ মহল কেমন করে দেশের দুর্নীতি দূর করতে পারি?

হোক সে নেতা, হোক সে ধন কুবের তাই বলে তোমরা তাদের আশ্রয় দেবে?

প্রশ্রয় আমরা দেই না শামীমা এইসব ব্যক্তির কুকর্মে সহায়ক দেশের জনগণ। দেশের জনগণের প্রশ্রয়েই এরা দেশ ও দেশের জনগণকে শোষণ করে চলেছে। সমস্ত দেশবাসী যদি এইসব অসৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো তাহলে এরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে সাহসী হতো না।

জনগণ নিরীহ অসহায় আর তারা বুঝেই বা কি, এসবে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

তুমি মিথ্যা বলোনি শামীমা---

মিঃ আরিফের কথা শেষ হয় না, টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে।

রিসিভার হাতে উঠিয়ে নিলেন মিঃ আরিফ—হ্যালো, আমি মিঃ আরিফ চৌধুরী বলছি--

ওপাশ থেকে ভেসে আসে একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর হ্যালো মিঃ চৌধুরী আপনি মিঃ কোরেশীর লাশ মর্গে পাঠিয়ে চলে এসেছেন দেখছি যাক ভাল কথা আপনার স্ত্রীর মুখে এতক্ষণে সব জেনে নিয়েছেন নিশ্চয়ই আমি আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার বাসায় গিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম---

মিঃ আরিফ যেন হতবাক হয়ে গিয়েছেন, শক্ত করে রিসিভার খানা চেপে ধরে বললেন—আপনি কে—কে কথা বলছেন? হ্যালো, হ্যালো আপনি---

ওদিকে হাসির মৃদু শব্দ—আপনি এখনও আমাকে চিনতে পারেননি-- হ্যালো মিঃ চৌধুরী আমি দস্যু বনহুর বলছি---

দস্যু বনহুর--

মিসেস আরিফ সরে এলেন শয্যা থেকে, স্বামীর মুখে দস্যু বনহুর নামটা শুনে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বিপুল আগ্রহে ঝুকে পড়লেন রিসিভারের পাশে।

মিঃ আরিফ চঞ্চল ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—দস্যু বনহুর তুমি আমার বাসায় আসার সাহসী হয়েছিলে কি করে? জানো না তোমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সরকার এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন---

জানি, আর জানি বলেই অন্য কারো বাড়ি না গিয়ে আপনার বাসায় হাজির হয়েছিলাম কিন্তু কেন গিয়েছিলাম সে কথা এতক্ষণ জেনেছেন নিশ্চয়ই। আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেশের শত্রু বিনাশে আত্মনিয়োগ করুন। হ্যালো মিঃ চৌধুরী আপনারা যদি সবাই ন্যায় আর ন্যায্য দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেকে কাজ করেন তাহলে আমাকে এমনভাবে হত্যালীলা চালাতে হবেনা। দেশের যারা শত্রু, দুর্নীতি যাদের পেশা, তাদের খুঁজে বের করে বিচার করুন শাস্তি দিন।

মিঃ আরিফ শুনেই চলেছেন—তিনি কি জবাব দেবেন ভেবে পান না যেন আরষ্ট হয়ে গেছেন তিনি।

ওপাশ থেকে শোনা যায় সেই বলিষ্ঠ পৌরুষ কণ্ঠস্বর এ ব্যাপারে অবহেলা করলে আমি বাধ্য হবো ইউসুফ আলী কোরেশীর মত সবাইকে শায়েস্তা করতে---

এবার মিঃ আরিফ বললেন—হ্যালো, তুমি কোথা থেকে বলছো, নিশ্চয়ই জানাতে ভয় পাবে না---

না, মোটেই না---আপনি যখন আমার উপস্থিতি স্থান জানার জন্য উৎসুক তবে নিশ্চয়ই জানাবো---হ্যালো মিঃ চৌধুরী শুনুন আমি আমার শহরের আস্তানা থেকে বলছি। আজ তাহলে বিদায় বন্ধু--

ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

মিঃ আরিফ চৌধুরী যেন পাথরের মূর্তি বনে গেছেন। রিসিভার রাখার কথাটাও যেন ভুলে গেছেন তিনি। আরষ্ট হয়ে বসে রইলেন। তিনি হয়তো ভাবছেন, যে দস্যু, বনহুর গ্রেপ্তারে তিনি এদেশে এসেছেন, যার সন্ধানে তিনি অহরহ ছুটাছুটি করে ফিরছেন, যাকে গ্রেপ্তারের জন্য একলক্ষ টাকা সরকার ঘোষণা করেছেন, সেই দস্যু বনহুর এই মাত্র তাঁর সঙ্গে ফোনে আলাপ করলো। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে গেছে সে---

মিসেস আরিফ স্বামীকে আরষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেখে বললেন—কি হলো তোমার?

এ্যাঁ---রিসিভার রেখে বললেন মিঃ আরিফ—দস্যু বনহুর শহরের কোনো এক স্থান হতে আমার সঙ্গে আলাপ করলো। আমাকে সাবধান করে দিলো, যেন দেশের শত্রু বিনাশে আত্মনিয়োগ করি।

মিসেস আরিফ বললেন—এটা পুলিশ মহলের একান্ত কর্তব্য।

ঠিক বলেছো শামীমা দেশের চারিদিকে আজ যেভাবে অন্যায় অনাচার দুর্নীতি চলেছে, তাতে দেশের জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

তাই চাই এর প্রতিকার।

হাঁ, চাই এর প্রতিকার।

❑

ইরানী ফিরে তাকালো, দেখলো দস্যু বনহুর তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ইরানী ভয় বিহ্বলভাবে শয্যায় উঠে বসলো তার দু'চোখে ফুটে উঠেছে একটা ভীতিভাব।

বনহুর আরও সরে আসছে।

কক্ষের মোমের আলোতে বনহুরের চোখ দুটো যেন জ্বলছে সমস্ত শরীরে তার জমকালো ড্রেস, মাথার পাগড়ীর কিছু অংশ দিয়ে মুখমণ্ডলের নিচের দিকটা ঢাকা।

বনহুর ঠিক ইরানীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো।

ইরানী সরে গেলো আরও দূরে। নির্জন বাংলোর অভ্যন্তরে মাত্র তারা দুটি প্রাণী। মনসুর ডাকুর কন্যা হয়েও আজ সে সম্পূর্ণ অসহায়। হাজার সাহসী হলেও সে নারী, আর দস্যু বনহুর এক দুঃসাহসী পুরুষ।

ইরানী জানে, তার বাবা দস্যু বনহুরের প্রতি কত নির্মম আচরণ করেছে। তাকে বন্দী করে তার উপর চালিয়েছে অকথ্য অত্যাচার। কষাঘাতে জর্জরিত করেছে তার সমস্ত দেহ। তাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করার জন্যও সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিলো কিন্তু অলৌকিকভাবে উদ্ধার পেয়েছিলো সেদিন বনহুর। সব আজ ইরানীর মনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে। তাছাড়া বনহুরের শিশু পুত্রকে তার পিতা কী চরম শাস্তি দিয়েছিলো। এত টুকু কচি শিশু, তাকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে মারার চেষ্টা চালিয়েছিলো তাকে একফোটা পানি না দিয়ে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে ছিলো--ইরানীর চোখে ভাসতে থাকে এসব দৃশ্য।

বনহুর বলে উঠে—ইরানী সেদিন তুমি পালিয়ে আমার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলে। কিন্তু আজ কোথায় পালাবে?

ইরানী ব্যাকুল অসহায় দৃষ্টি মেলে চারিদিকে তাকালো। ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো—দস্যু হলেও তুমি না মহৎ--তুমি নাকি কারো ক্ষতি করো না---

অট্টহাসি হেসে উঠলো দস্যু বনহুর, তারপর হাসি বন্ধ করে বললো—কে তোমাকে এ কথা বলেছে, দস্যু ডাকু এরা কোনো দিন মহৎ হয় না। তোমার বাবাকে দেখে কি তুমি বুঝনি। ইরানী আমার শিশু পুত্রের প্রতি তার আচরণ কোনো দিন আমি ভুলবো না।

তুমি আমার প্রতি সেই প্রতিশোধ নিতে চাও?

এতক্ষণে তাহলে বুঝতে পেরেছো। বনহুর এবার নিজের মুখের নিচের অংশ থেকে পাগড়ীর আঁচলখানা সরিয়ে ফেলে।

ইরানী দেখতে পায় বনহুরের মুখে একটি কঠিন প্রতিহিংসা ভাব ফুটে উঠেছে। হৃৎপিন্ড কেঁপে উঠে যেন তার। আজ কিছুতেই বনহুরের কবল থেকে রক্ষা নেই। তার বাবা বনহুর এবং তার সন্তানের প্রতি যে জঘন্য আচরণ করেছিলো আজ তাকেই তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে। পিতার প্রতি রাগে ফুলতে থাকে ইরানী মনের দারুণ ক্রোধ দমন করে মিনতিভরা কণ্ঠে বলে—বনহুর তুমি আমাকে এবারের মত ক্ষমা করো---

তুমি তো জানো, দস্যু বনহুর কাউকে ক্ষমা করে না।

তোমার যে রূপ আমি সেদিন দেখেছি, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তবু করজোড়ে বলছি, আমাকে তুমি পরিত্রাণ দাও—আজকের মত পরিত্রাণ দাও।

বনহুরের মুখে একটা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি ফুটে উঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে—এতদিন তোমাকে ক্ষমা করে পরিত্রাণ দিয়েছি ইরানী আজ তুমি রেহাই পাবে না----বনহুর খুলে ফেলে মাথার পাগড়ীটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় বিছানার উপর।

ইরানী বিছানা থেকে নেমে সরে যায়, ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় বনহুরের দিকে।

বনহুর বলে —তুমি না আমায় বন্দী করবে বলেছিলে? এই তো তোমার সম্মুখে আমি হাজির। পালাচ্ছো কেন?

না না, আমি আমি তোমাকে বন্দী করতে চাইনি।

মিথ্যা কথা বলতে বাধছে না তোমার? পিতার সঙ্গে তুমিও যোগ দিয়ে দস্যু বনহুরকে পুলিশের কবলে পাকড়াও করানোর জন্যই কি তোমরা সেদিন

পুলিশ প্রাঙ্গনে উৎসবে যোগ দাওনি? তোমার বাবা ভদ্রলোক সেজে মস্ত একফাঁদ পেতেছিলো কিন্তু সে ফাঁদে সে নিজেই আটকা পড়েছে। তুমিও আটকা পড়তে কিন্তু আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি।

সেইজন্য তুমি আমাকে এভাবে--

হাঁ, আজ আমি অবসর আছি, নেই কোনো কাজ, তাই এসেছি তোমার বিচারে। বনহুরের মুখেচোখে ফুটে উঠে একটা অদ্ভুত ভাবের আভাস।

ইরানী বুঝতে পারে আজ দস্যু বনহুরের কবল থেকে তার পরিত্রাণ নেই। মরিয়া হয়ে ইরানী পিছু হটতে থাকে।

বনহুর আরও সরে আসে।

নিস্তব্ধ কক্ষের মেঝেতে বনহুরের ভারী বুটের আওয়াজ একটা অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করে চলেছে। এগুচ্ছে বনহুর ইরানীর দিকে। দক্ষিণ হাতখানা তার সম্মুখে প্রসারিত।

ইরানী একটা ফুলদানি তুলে নিয়ে ছুড়ে মারে বনহুরের দিকে।

বনহুর লুফে নিয়ে টেবিলে রাখে।

এবার ইরানী ওপাশ থেকে একটা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা নিয়ে বনহুরের বুক লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে।

ছোরাখানা গিয়ে বিদ্ধ হয় পিছন দেয়ালের একটি গোলকা চিহ্নের ঠিক মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত কান্ড ঘটে যায়। ইরানী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই জায়গাটার মেঝে ফাঁক হয়ে যায় আকস্মাৎ ইরানী পড়ে যায় অতল গহ্বরে।

বনহুর হেসে উঠে— হাঃ হাঃ হাঃ।

পরবর্তী বই

মৃত্যু বিভীষিকা

মৃত্যু-বিভীষিকা—৫০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ইরানীর সংজ্ঞা ফিরে এলো এক সময়। চোখ মেলে তাকাতেই সে অবাক হলো, দেখলো একটি নৌকার মধ্যে সুন্দর একটা শয্যায় শায়িতা সে। তাকে চোখ মেলতে দেখে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, ইরানীর পাশে বসে বললেন— এখন কেমন লাগছে তোমার?

ইরানী অবাক হয়ে তাকালো ভদ্রলোকটির মুখের দিকে। তাকে কোথাও দেখেছে কিনা ভাবতে লাগলো, আরও ভাবছে সে ঐ নৌকায় এলো কি করে! সব কথা মনে পড়লো ইরানীর ধীরে ধীরে। দস্যু বনহুরকে সে ছোরা নিক্ষেপ করেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গিয়েছিলো কোন্ অতল গহ্বরে। এরপর আর কিছু মনে নেই ইরানীর।

তবে কি সে এখন মুক্ত? সেই নির্জন বাংলোর অভ্যন্তর থেকে সেকি তবে উদ্ধার পেয়েছে? কি করে সে এ নৌকায় এলো, কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না।

ইরানীকে নিস্তব্ধ হয়ে ভাবতে দেখে বললেন বয়স্ক ভদ্রলোক —কি ভাবছো মা তুমি? সুস্থ হও, সব বলবো তোমাকে।

ইরানী বললো এবার— আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি কে এবং আমিই বা আপনার নৌকায় এলাম কি করে বলুন?

বয়স্ক ভদ্রলোক দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন— আমি হিজল দ্বীপের অধিবাসী। কান্দাই-এ আমার কারবার আছে। কোনো কাজে আমি কয়েকদিন পূর্বে কান্দাই গিয়েছিলাম। কাজ শেষ করে কান্দাই থেকে ফিরছি। গত রাতে কান্দাই ফুলগ্রাম ঘাটে নৌকা রেখে আমার মাঝিরা বিশ্রাম করেছিলো, কারণ ফুলগ্রাম ঘাটে পৌঁছে আমাদের সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যা হওয়ায় মাঝিরা আর এগুতে চায় না, কারণ চারিদিকে দস্যু বনহুরের আতঙ্ক। সেইজন্যই আমিও রাজি হলাম ফুলগ্রাম ঘাটে রাত কাটাতে।

ইরানী ব্যাকুল কণ্ঠে বললো— আমি কি করে আপনার নৌকায় এলাম সে কথা বলুন?

হাঁ, সেই কথাই বলছি। রাত ভোর হলো এক সময়। আমি উঠে পড়লাম, মাঝিদের ডেকে নৌকা ছাড়বার আদেশ দিলাম। মাঝিরা উঠে মুখ-হাত ধুয়ে নিচ্ছিলো। আমি নৌকার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অপরূপ

সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। পূর্ব আকাশ উজ্জ্বল করে সূর্যের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে— আমি সেই দৃশ্য দেখছি, হঠাৎ আমার নজরে পড়লো, আমারই নৌকার পাশে পানির মধ্যে একটি অর্ধ নিমজ্জিত নারীদেহ।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো ইরানী— তারপর?

আমি মাঝিদের ডেকে দেখলাম এবং নিমজ্জিত নারীকে তুলে আনার জন্যে আদেশ দিলাম। মাঝিরা আমার আদেশ পালন করলো। সেই নিমজ্জিত নারীটিই তুমি!

আমি.......আমি পানিতে পড়েছিলাম।

হাঁ, তুমি পানিতে পড়েছিলে। তোমার সংজ্ঞা ছিলো না, অনেক চেষ্টায় তোমার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

ইরানী ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায়। তার চোখের সম্মুখে ভাসতে থাকে সেই রাতের ঘটনা...... দস্যু বনহুর তাকে ধরতে যাচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে সে একখানা ছোরা নিক্ষেপ করেছিলো তাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু ছোরাখানা দস্যু বনহুরের দেহে বিদ্ধ না হয়ে বিদ্ধ হয়েছিলো পিছনের দেয়ালে, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়েছিলো সে নিচে, কিন্তু কোথায় পড়লো আর তার স্মরণ নেই।

ইরানীকে ভাবতে দেখে বললেন বয়স্ক ভদ্রলোকটি— তুমি কিছু ভেবো না মা। এখন কোথায় তুমি যেতে চাও, আমি তোমাকে সেখানেই পৌঁছে দেবো!

ইরানী চট্ করে কোনো জবাব দিতে পারলো না, এখন কোথায় যাবে সে। তার বাবা এখন হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী। তবু ফিরে যাবে ইরানী তাদের আস্তানায়। ইরানী বললো— আপনি আমাকে উদ্ধার করেছেন, আমার জীবন রক্ষা করেছেন, কাজেই আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার পিতৃস্থানীয় আপনি। আমাকে যদি কান্দাই-এর যে কোন ঘাটে নামিয়ে দেন, আমি যারপরনাই খুশি হবো।

বেশ, আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো যেখানে তুমি যেতে চাও।

ইরানীকে ঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছো তো? রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর।

রহমান মাথা নিচু করে জবাব দিলো— হাঁ সর্দার, ইরানীকে ঠিক তার কথামত পৌঁছে দিয়েছি।

তোমাকে চিনে ফেলেনি তো?

না, আমাকে সে চিনতে পারেনি, কারণ আমার ছদ্মবেশ অত্যন্ত নিখুঁত হয়েছিলো।

হ্যাঁ, আমিই তোমাকে প্রথম নজরে চিনতে পারিনি। ঠিক একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বলেই তোমাকে মনে হচ্ছিলো। ইরানীর জ্ঞান ফেরার পর সে কি কোনো প্রশ্ন করেছিলো?

করেছিলো।

কি জিজ্ঞাসা করেছিলো সে?

ইরানী নিজেকে একটি নৌকার মধ্যে দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলো। আমাকে সে জিজ্ঞাসা করেছিলো — এ নৌকায় আমি কেমন করে এলাম?

তুমি কি জবাব দিয়েছিলে?

রহমান ইরানীকে যা বলেছিলো সব কথা গুছিয়ে বলে গেলো সর্দারের কাছে।

সব শুনে বনহুর মৃদু হেসে বললো— চমৎকার জবাব দিয়েছিলে রহমান। যাক, একটা দিক নিশ্চিন্ত হলাম।

সর্দার, ইরানীকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হলো? ডাকুর কন্যা, সেও তার পিতার মতই হিংস্র।

কিন্তু তুমি তো জানো, তোমাদের সর্দার কোনোদিন কোনো অসহায়া নারীর প্রতি জঘন্য আচরণ করেনি। তবু ইরানীর সঙ্গে আমাকে কিছুটা অভিনয় করতে হয়েছিলো। ইরানীর কাছে আমার একটা অমানুষিক রূপ তুলে ধরেছিলাম। তাকে জানাতে চাই, দস্যু বনহুর তার বাবার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এবং সে কারণেই আমি তাকে পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণের উৎসব থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। রহমান?

বলুন সর্দার?

এবার আর একটা কাজ আমাকে সমাধা করতে হচ্ছে। মাহমুদার বিয়ে দিবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাঁ সর্দার, আমিও এ কথা আপনাকে বলবো বলবো ভাবছি। মাহমুদার বয়স হয়েছে।

তাছাড়া তাকে এভাবে আমাদের আস্তানায় রাখাও ঠিক নয়। তার একটা বিবেক আছে। সে সভ্য সমাজের মানুষ আর আমরা.....

তুমি সবকিছু আয়োজন করো। আমি মনিরাকে বলেছি একটা ভাল পাত্র খুঁজে বের করতে।

আচ্ছা সর্দার।

সেদিনের পর থেকে রহমান মাহমুদার বিয়ের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

এখানে রহমান যেমন বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত তেমনি মনিরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মাহমুদার জন্য একটি সৎ পাত্রের সন্ধানে। মনিরার বান্ধবীর ভাই আহসানকে তার খুব পছন্দ। ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত, সুন্দর, নম্র ও ভদ্র।

মনিরা একদিন বান্ধবী ইশরাৎ জাহানের বাড়ি বেড়াতে গেলো। সেইদিন সে কথায় কথায় বললো— ইশরাৎ, আমার একটি ছোট বোন আছে— খালার মেয়ে তোর ভাই আহসানের সঙ্গে বেশ মানাতো কিন্তু।

ইশরাৎ জাহান তো খুশিতে আত্মহারা, মনিরার বোন হবে তার ভাবী— কম কথা নয়! উচ্ছল কণ্ঠে বললো ইশরাৎ জাহান —তোর বোন তো তোর মত হবে?

যদিও মনিরা মাহমুদাকে দেখেনি তবু বললো সে— হাঁ, আমার চেয়েও সুন্দরী। যেমন রূপ তেমনি গুণ— সব দিকেই আছে।

ইশরাৎ জাহান আনন্দভরা কণ্ঠে বললো—তাহলে তো কথাই নেই।

মনিরা বান্ধবীর কাছে আশ্বাসবাণী পেয়ে ফিরে এলো বাড়িতে। স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলো সে বিপুল আগ্রহ নিয়ে!

একদিন বনহুর এলো কিন্তু মাহমুদাকে সঙ্গে আনা তার হয়নি।

মনিরা রাগতভাবে বললো— কই, তোমার সেই বোনটিকে আজও আনলো না?

তুমি পাত্র ঠিক করে নাও, আমি তাকে আনবো। মনিরার চিবুকে মৃদু নাড়া দিয়ে বললো বনহুর।

মনিরা বললো— পাত্র ঠিক হয়ে গেছে।

বনহুর আনন্দে আত্মহারা হয়ে মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো— লক্ষ্মীটি আমার, সত্যি তুমি কাজের মেয়ে..........

মনিরা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো— আঃ ছেড়ে দাও, কেউ এসে পড়তে পারে।

এলেই বা, ক্ষতি কি?

সত্যি তোমার লজ্জাও নেই।

না, লজ্জা আমি মানি না, করি না, জানি না....... বনহুর মনিরার মুখখানা তুলে ধরে।

এমন সময় দরজার বাইরে শোনা যায় নূরের কণ্ঠস্বর— আম্মি, আম্মি.......

বনহুরের হাত দু'খানা জোর করে ছাড়িয়ে সরে দাঁড়ায় মনিরা, বলে— কি বলছো নূর, আমি এখানে।

নূর কক্ষে প্রবেশ করে বনহুরকে দেখতে পেয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠে— আব্বু.... ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে সে পিতাকে।

বনহুর দু'হাতে তুলে নিলো নূরকে, উঁচু করে ধরে বললো —কোথায় গিয়েছিলে আব্বু? আমি অনেকক্ষণ তোমাকে খুঁজছি।

আমি সরকার দাদুর সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এই দেখো আব্বু, দস্যু বনহুরের কাজ দেখো। নূর হাতের পত্রিকাখানা পিতার সম্মুখে মেলে ধরলো।

মনিরা বললো— তোমার আব্বু তোমার পূর্বেই দেখেছে। নিয়ে যাও নূর।

না, আমি আব্বুকে দেখাবো। এই দেখো, দস্যু বনহুর আবার একজন লোককে খুন করেছে। এই দেখো কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ....

বনহুর কিন্তু গম্ভীর হয়ে পড়েছে মুহূর্তে। পুত্রের হস্তস্থিত পত্রিকায় নজর বুলিয়ে বললো—হয়তো এই লোকটা কোনো অন্যায় কাজ করেছিলো তাই তাকে দস্যু বনহুর এভাবে হত্যা করেছে, মানে তাকে উপযুক্ত সাজা দিয়েছে।

বনহুর দেখলো, ওষুধের ব্যবসায়ী ইউসুফ কোরেশীর নিহত অবস্থার ছবিখানাই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার শোভাবর্ধন করছে। বড় বড় অক্ষরে লিখা রয়েছে "মৃত্যু বিভীষিকা"। "দস্যু বনহুরের আর একটি শিকার"। কাগজখানা ভাঁজ করে ছুড়ে ফেলে দিলো বনহুর, তারপর নূরকে আদর করে বললো— ওসব দেখতে নেই আব্বু। এসো আমার গল্প করি।

নূর কিন্তু সহজে ভোলার ছেলে নয়, সে বললো—আব্বু, দস্যু বনহুরের কি এতটুকু মায়া নেই?

বনহুর নূরের কথায় চট্ করে জবাব দিতেও পারলো না।

মনিরা বললো— চুপ করে আছো কেন, জবাব দাও? নূর তোমাকে কি প্রশ্ন করছে, শুনতে পাচ্ছো না?

উঁ, কি বললে বাপু?

বলছি দস্যু বনহুরের কি মায়া-দয়া কিছু নেই? কি নিষ্ঠুর সেই দস্যুটা! আব্বু, তুমি না বলেছিলে তাকে দেখেছো?

হাঁ দেখেছি।

ভয়ঙ্কর দেখতে বুঝি?

একদিন তো তোমাকে বলেছি, খুব ভয়ঙ্কর দেখতে। মস্ত বড় মাথা, হেঁইয়া বড় চোখ, মূলোর মত দাঁত.....

যেমন দেখতে তেমনি নিষ্ঠুর, তাই বুঝি এত মানুষকে হত্যা করে সে?

আব্বু, দস্যু বনহুর আমার বন্ধু।

ঐ ভয়ঙ্কর কুৎসিত দস্যু তোমার বন্ধু?

হুঁ।

তোমাকে যদি খুন করে সে?

আমি আমার বন্ধুকে চিনি— সে বিনা অপরাধে কাউকে স্পর্শ করে না, খুন করা তো দূরের কথা। তুমি তাকে যত নিষ্ঠুর ভাবছো তত নয়।

তোমাকে সে কিছু বলে না?

আমি তো কারো অন্যায় করি না, তবে কেন সে আমাকে কিছু বলবে?

দস্যু বনহুরকে একবার আমায় দেখাবো আব্বু? তোমার যদি বন্ধু হয় সে, তবে আমাকেও কিছু বলবে না।

আচ্ছা দেখাবো, এত যখন সখ তোমার!

আব্বু?

বলো?

আমি চুপি চুপি দেখবো, সামনে যাবো না কিন্তু।

আচ্ছা, তুমি তোমার আম্মির কোলে চুপটি করে বসে থাকবে আর আমি দস্যু বনহুরকে ধরে আনবো.... কি বলো মনিরা, সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে।

মনিরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে— তোমরা বাপ-বেটা যা খুশি করো, আমি চললাম।

মনিরা বেরিয়ে গেলো।

বনহুর নূরকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করে বললো— নূর, এবার তোমার এক খালাকে নিয়ে আসবো।

খালা?

হাঁ, তোমার খালা। খুব ভাল মেয়ে, এলে তোমাকে অনেক আদর করবে।

সত্যি বলছো আব্বু?

হাঁ, সত্যি।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর একদিন বনহুর মাহমুদাকে নিয়ে হাজির হলো চৌধুরী বাড়িতে।

মরিয়ম বেগমকে ডেকে বললো বনহুর—মা, তোমার কোনো মেয়ে ছিলো না, তাই মেয়ে এনে দিলাম, নাও।

মাহমুদা মরিয়ম বেগমকে সালাম করতেই মরিয়ম বেগম বুকে টেনে নিলেন ওকে, স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন—তোমার কথা সব শুনেছি মা। তুমি এখন থেকে আমার মেয়ে হলে।

মনিরা এগিয়ে এলো।

বনহুর বললো— এ আমার স্ত্রী মনিরা!

মাহমুদা অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলো—ভাবী!

মনিরা জড়িয়ে ধরলো মাহমুদাকে বুকে, বললো— ভাবী নয়, আপা!

নূর দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিলো, বনহুর নূরকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেললো— এসো, তোমার খালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। মাহমুদার কাছে নিয়ে এলো বনহুর নূরকে।

মাহমুদা নূরকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলো।

নূরও তার নতুন খালাকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলো।

মাহমুদা যখন নূরকে কোলের মধ্যে টেনে আদর করছিলো তখন বনহুরের মন এক অপূর্ব ভাবের আবেশে দীপ্ত হয়ে উঠছিলো।

মা ও স্ত্রীর হাতে মাহমুদাকে তুলে দিয়ে বনহুর ভোর রাতে সকলের অজ্ঞাতে সরে পড়লো চৌধুরী বাড়ি থেকে।

মনিরা নিজের বোনের মত মাহমুদাকে আপন করে নিলো। সব সময় নিজের পাশে পাশে ওকে রাখে, নিজ হাতে সাজিয়ে দেয়।

মাহমুদাও গভীরভাবে ভালবেসে ফেললো মরিয়ম বেগম মনিরা আর নূরকে। নূরের পড়াশোনা থেকে নূরের গোসল খাওয়া-দাওয়া সব মাহমুদা করে।

নূর মাহমুদাকে খালা আম্মি বলে ডাকে।

মাহমুদা এ বাড়িরই একজন বনে গেছে।

মনিরা একদিন মাহমুদাকে সুন্দর করে সাজালো, বললো— মাহমুদা আজ এক জায়গায় বেড়াতে যাবো, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

মাহমুদা মনিরার কথায় অমত করতে পারলো না।

মনিরা মাহমুদাসহ তার বান্দবী ইশরাৎ জাহানের বাড়ি বেড়াতে এলো।

ইশরাৎ জাহান তো মাহমুদাকে দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। সত্যি, এত সুন্দরী মেয়ে তার নজরে খুব কমই পড়েছে। বললো ইশরাৎ জাহান— তোর বোন ঠিক তোর মতই কিন্তু, ভারী সুন্দরী.....

কি, পছন্দ হয়েছে তাহলে?

খুব।

কিন্তু তোর ভাইয়ার পছন্দ হলে তবেই হয়।

নিশ্চয়ই ভাইয়ার পছন্দ হবে, বললো ইশরাৎ জাহান। আরও বললো সে— ভাইয়াকে ধরে আনছি, তারপর ছুটে পালাতে যাচ্ছিলো ইশরাৎ জাহান।

মনিরা বললো— শোন্ আমি তোকে একটা বুদ্ধি বাতলে দিই।

মাহমুদা লজ্জায় আরষ্ট হয়ে বললো— তোমরা এসব কি আরম্ভ করলে আপা, আমি কিন্তু চলে যাবো।

চলে যাবো বললেই হলো আর কি! বিয়ে যেন করতেই হবে না তোমাকে। কথাগুলো বলে ইশরাৎ জাহান মনিরার গায়ে টিপ দিলো।

মনিরা ইশরাৎ জাহানের কানে কানে কি যেন বললো।

হাসলো ইশরাৎ জাহান। তারপর বললো— চলো আমরা বাগানে যাই।

মনিরা বললো— তাই চল, বাগানে মুক্ত হাওয়ায় বসে গল্প করা যাবে।

মাহমুদা বুঝতে পারলো, তারা কোনো যুক্তি এঁটেছে। একটু হেসে বললো— চলো আপা।

বাগানে এসে বসলো ওরা তিনজন।

এ গল্প সে গল্পে মেতে উঠলো তারা।

ইশরাৎ জাহান বললো— এই যা, তোমাদের জন্য নাস্তা আনতে বলবো, তা ভুলেই গেছি। ইশরাৎ জাহান দ্রুত চলে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো— সঙ্গে বয়ের হাতে প্রচুর নাস্তা।

ঠিক তার সঙ্গে আর একজনকে দেখা গেলো, সে হলো ইশরাৎ জাহানের ভাই আহসান। ওকে ফাঁকি দিয়ে ডেকে এনেছে ইশরাৎ জাহান।

আহসান বোনের ডাকে বাগানে এসে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলো। সে ভাবতে পারেনি, বাগানে আরও দুঃজন মহিলা আছে।

ইশরাৎ জাহান বললো—ভাইয়া, এরা আমার বান্ধবী! এর নাম মনিরা আর এর নাম মাহমুদা। তবে মনিরার সঙ্গে তোমার অনেক দিন আগে দেখা হয়েছিলো— হয়তো বিদেশে গিয়ে সব ভুলে বসে আছো।

হঠাৎ আহসানের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো— মাফ করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

থাক, অত মাফ চাইতে হবে না। আমার বান্ধবী সে জন্য মোটেই দুঃখিত নয়।

আর ইনি আমার বান্ধবীর ছোট বোন মাহমুদা, আমারও বান্ধবী বলতে পারো।

আহসান মাহমুদার দিকে তাকিয়ে হাসলো, বললো— তোর বান্ধবীরা দেখছি বড্ড লাজুক মেয়ে।

বাঙ্গালি মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ তাকি জানো না ভাইয়া?

কিন্তু এত লজ্জা ভাল দেখায় না। বিদেশী মেয়েরা কেমন পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে তাকি তোমরা জানো না?

জানি। তা তুমি মনে করছো আমার বান্ধবী বুঝি বড্ড লাজুক? আসলে যা মনে করছো তা নয়, কিছুক্ষণ আলাপ করলেই বুঝতে পারবে। তা বসো আলাপ ও হবে এখন।

কই, তোর বান্ধবীরা তো আমায় বসতে বলছে না?

মনিরা বললো এবার— বসুন!

বাগানের মধ্যে সাজানো ছিলো কতকগুলো হাল্কা সোফা সেট। আহসান একটা সোফায় বসে পড়লো।

ইশরাৎ জাহান মনিরা আর মাহমুদাকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়লো। মাঝখানে ছোট টেবিলটায় নাস্তা সাজানো। ইশরাৎ জাহান এগিয়ে দিলো বান্ধবীদের দিকে নাস্তার প্লেটগুলো। আহসানের সম্মুখে একটি প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললো— তুমিও খাও।

আহসান কিন্তু বারবার তাকাচ্ছিলো মনিরার দিকে। একদিন এই মনিরাকে কেন্দ্র করে সে কত কল্পনার রঙিন স্বপ্ন দেখতো। মনিরা তখন কলেজের ছাত্রী, ইশরাৎ জাহানের সঙ্গে সে মাঝে মাঝে আসতো তাদের বাড়িতে। তখন আহসান মনিরাকে ভালবেসে ফেলেছিলো কিন্তু তাকে

কোনোদিন সে নাগালের মধ্যে পায়নি, তাই তার ব্যাকুল ভালবাসার কথাও জানাতে পারেনি। আজ সেই কল্পনার রাণী এসেছে তার সম্মুখে। আহসান যেন নতুন এক উন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে উঠেছে। বিদেশে গিয়ে বহু মেয়ের সঙ্গে সে মিশেছে, বহু মেয়েকে সে উপভোগ করেছে, তবু তার পিপাসা মেটেনি, মনিরাকে সে নতুনভাবে আবিষ্কার করে।

আহসানের আসল রূপ জানে না মনিরা— সে জানে, ইশরাৎ জাহানের ভাই বোনের মতই স্বচ্ছমনা স্বাভাবিক ছেলে। চেহারা সুন্দর, উচ্চ ডিগ্রীধারী, বংশমর্যাদা ভাল, সেই কারণেই মনিরা আহসানকে পছন্দ করেছে মাহমুদার জন্য।

ইশরাৎ জাহানের কাছেও আহসানের আসল রূপ ধরা পড়েনি তেমন করে, কারণ সে জানে, তার ভাই একজন মহৎ ব্যক্তি। আহসান গোপনে মদ পান করতো, ক্লাবে যেতো, মাঝে মাঝে কান্দাই নাচঘরেও দেখা যেতো তাকে।

আহসান তার আসল চেহারা লুকিয়ে নিজকে অতি ভদ্র বেশে তুলে ধরলো মনিরা আর মাহমুদার সম্মুখে।

এ কথা সে কথা নিয়ে অল্পক্ষণেই আলাপ জমিয়ে নিলো আহসান মনিরার আর মাহমুদার সঙ্গে।

মনিরাও চেয়েছিলো আহসানের সামনে মাহমুদা যেন স্বাভাবিক হয়ে আসে। তাই এক সময় ছলনা করে দু'বান্ধবী সরে পড়লো সেখান থেকে।

মাহমুদা আর আহসান ওরা দু'জনা রইলো একা।

ইশরাৎ জাহান আর মনিরা সরে গেলে মাহমুদা বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলো, লজ্জায় যেন কুঁকড়ে যাচ্ছিলো সে।

আহসান মৃদু হেসে বলে— বান্ধবীদের সঙ্গে পালাতে না পেরে খুব বুঝি ঘাবড়ে যাচ্ছেন?

এবার মাহমুদা কথা না বলে পারলো না, বললো সে— না,

ওসব কিছু না।

তবে সোজা হয়ে বসুন, তাকান আমার দিকে।

মাহমুদা চোখ না তুলে পারলো না। সে লজ্জানত দৃষ্টি তুলে ধরলো আহসানের মুখে।

আহসান বললো— এবার দেখুন দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা কত সহজ হয়ে এলাম। আচ্ছা মিস মাহমুদা, আপনি কি বরাবরই এখানে মানে চৌধুরী বাড়িতে থাকেন?

না, আমি দেশে ছিলাম, অল্পদিন হলো এসেছি।

সত্যি, আপনার কণ্ঠস্বর অতি মধুর। নিশ্চয়ই আপনি গান জানেন?

মাহমুদা চট করে জবাব দিলো না, যদিও সে পূর্বে ভাল গাইতে পারতো, এখন বহুদিন অভ্যাস নেই। বললো মাহমুদা—আগে গাইতাম কিন্তু এখন গাই না।

আজ না হয় একটা গান আমাকে শোনালেন।

আজ নয়, আর একদিন গাইবো।

সত্যি, কথা দিলেন তো?

হাঁ দিলাম।

এমন সময় ফিরে এলো মনিরা আর ইশরাৎ জাহান। ইশরাৎ জাহান হেসে বললো— কিসের এমন কথা দেওয়া নেওয়া হয়ে গেলো এরি মধ্যে?

লজ্জায় কুঁকড়ে গেলো যেন মাহমুদা, হঠাৎ ওরা এসে পড়ায় বিব্রত হয়ে পড়লো সে।

আহসান বললো— কথা দিলেন, একদিন নাকি উনি গান শোনাবেন।

ইশরাৎ জাহান আনন্দধ্বনি করে উঠলো—হুররে ভাইয়া, তুমি শুধু গান শুনবে আর আমরা বাদ পড়বো, তা হচ্ছে না। গান আমাদেরও শোনাতে হবে।

মনিরা হেসে বললো— মাহমুদা, ওকে একা যেন গান গেয়ে শুনিও না। আমার বান্ধবী ইশরাৎ যেন বাদ না পড়ে।

মাহমুদা বললো— আচ্ছা, মনে থাকবে।

একসময় ইশরাৎ জাহান আর আহসানের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো মনিরা আর মাহমুদা।

মনিরা বললো— কেমন লাগলো আহসান সাহেবকে?

ছোট্ট করে জবাব দিলো মাহমুদা— তোমার যেমন লেগেছে আমারও তেমনি।

মনিরা বললো— আমার খুব ভাল লাগলো। বেশ ভদ্রলোক। মাহমুদা, একটা কথা বলবো!

বলো?

আহসান সাহেবকে পেলে তুমি সুখী হবে তো?

মাহমুদা কথা বললো না, লজ্জায় মুখ নিচু করলো।

মনিরা বুঝতে পারলো,মাহমুদার কোনো আপত্তি নেই।

পরদিন মনিরা ইশরাৎ জাহানসহ আহসানকে দাওয়াত করলো। মরিয়ম বেগম নিজ হাতে রান্না করলেন। অনেক রকম জিনিস তৈরি করলেন।

সন্ধ্যার পর ইশরাৎ জাহান ও আহসান এলো চৌধুরী বাড়িতে।

মনিরা আনন্দে আত্মহারা, এত সহজে এমন একটা পাত্র পাওয়া কম কথা নয়। বিশেষ করে বনহুরকে তাক্ লাগিয়ে দেবে মনিরা ভাল একটা পাত্র মাহমুদার জন্য সংগ্রহ করে।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি থামতেই মনিরা বান্ধবী এবং আহসানকে অভ্যর্থনা জানালো।

মনিরাকে দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো ইশরাৎ জাহান।

আহসান ড্রাইভিং আসন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো— হ্যালো মনিরা, কেমন আছেন? হাত বাড়ালো সে মনিরার দিকে।

মনিরা হাত না বাড়িয়ে হাত তুলে আদাব করলো।

আহসান মনে মনে একটু ক্ষুণ্ন হলেও মুখে কোনো কথা প্রকাশ করলো না। এগিয়ে চললো তারা মনিরার সঙ্গে।

মরিয়ম বেগম সিঁড়ির মুখে তাদের এগিয়ে নিলেন।

মনিরা পরিচয় করিয়ে দিলো মামীমার সঙ্গে ইশরাৎ জাহান এবং আহসানের।

আহসানের ব্যবহারে মরিয়ম বেগম মুগ্ধ হলেন।

একসঙ্গে টেবিলে বসে খাবার খেলো সবাই মিলে। মাহমুদাও বসলো সবার সঙ্গে।

মরিয়ম বেগম নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালেন।

হাসি-গল্পের মধ্যে খাওয়া-পর্ব শেষ হলো।

নূর সবচেয়ে বেশি আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে। এক সময় চুপি চুপি বলেছিলো মনিরা নূরের কানে মুখ নিয়ে—এই লোকটি তোমার খালু হবে।

কথাটা শুনে নূর তো উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো, তার মনে কত রং ঝরে পড়তে লাগলো। তার মাহমুদা খালার বর হবে এই ভদ্রলোক, কম কথা নয়!

কিছু সময়ের মধ্যে আপন করে নিলো নূর আহসানকে।

❑

সেদিনের পর থেকে প্রায়ই আসা-যাওয়া শুরু করলো আহসান আর ইশরাৎ জাহান। বিকেলটা মেতে থাকতো ওরা নানারকম হাসি-গল্পে। কখনও হলঘরে বসে আলাপ-আলোচনা চলতো, কখনও বাগানে বসে মেতে উঠতো, কখনও গাড়ি নিয়ে যেতো ওরা লেকের ধারে।

মাঝে মাঝে পার্কেও যেতো মনিরা, মাহমুদা, ইশরাৎ জাহান আর তাদের সঙ্গে থাকতো আহসান।

মনিরা আর ইশরাৎ জাহান একথা সেকথায় সরে থাকতো ওদের দু'জনাকে মিশবার সুযোগ দিয়ে। মনিরা যা চেয়েছিলো তাই হলো। একদিন ইশরাৎ জাহান প্রস্তাব দিলো মনিরার কাছে— ভাইয়া মাহমুদাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেছে।

মনিরার সেদিন আনন্দ আর ধরে না। তার বাসনা পূর্ণ হলো তাহলে! মাহমুদার বিয়েতে মনিরা প্রচুর ধুমধাম করবে। বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো মনিরা স্বামীর।

সেদিন বিকেলে এলো আহসান আর ইশরাৎ জাহান।

মনিরা আর মাহমুদা প্রস্তুত ছিলো, বেরিয়ে পড়লো ওরা সবাই মিলে। আজ পার্কে বা লোকের ধারে নয়, আজ ওরা যাবে সমুদ্রের তীরে!

আহসান ড্রাইভ করছিলো।

ওরা তিন বান্ধবী মিলে পিছন আসনে বসে হাসি-গল্পে মেতে রইলো। আহসান ড্রাইভিং আসন থেকেই মাঝে মাঝে ওদের কথায় এবং হাসিতে যোগ দিচ্ছিলো।

এক সময় পৌঁছে গেলো তাদের গাড়ি সমুদ্রতীরে।

আহসান নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললো— আসুন। ইশরাৎ জাহান, মনিরা আর মাহমুদা নেমে পড়লো।

সমুদ্রের তীর ধরে এগুতে লাগলো ওরা।

এক-একজনের খুশি যেন ধরছে না।

মাহমুদা আর ইশরাৎ জাহান অনেকটা এগিয়ে যায়।

মনিরা বেশ একটু পিছিয়ে পড়েছিলো।

আহসান ইচ্ছা করেই পিছিয়ে পড়ে, মনিরার পাশে পাশে চলতে চলতে বলে—আজকের দিনটা বড় সুন্দর, তাই না?

হাঁ, ভারি সুন্দর!

আসুন না আমরা দু'জনা ওদের মত হাতে হাত রেখে ছুটি?

ধন্যবাদ, আমি ছুটতে পারি না।

দেখুন ওরা কতদূর এগিয়ে গেছে।

তাইতো দেখছি।

তবে বসুন, এখানে বসে গল্প করা যাক।

ঐ তো ওরা বসে পড়েছে, চলুন এক সঙ্গে বসে গল্প করা যাবে। মনিরা এগিয়ে চললো।

আহসান তাকে অনুসরণ করলো।

সমুদ্রতীরে বসে ওরা চারজন একথা সেকথা নিয়ে মেতে উঠলো।

অল্পক্ষণ পর একটা নৌকা এগিয়ে এলো। মাঝি ডেকে বললো— সাহেব, আপনারা সমুদ্র ভ্রমণে যাবেন?

খুশি হয়ে উঠলো ইশরাৎ জাহান, বললো— ভাইয়া, আমরা সমুদ্র ভ্রমণে যাবো।

আহসান মনিরার মুখে তাকিয়ে বললো—আপনি রাজি?

হাঁ, অনেকদিন সমুদ্র ভ্রমণে যাইনি— কিরে মাহমুদা, রাজি তো?

আহসান বললো— আপনি রাজি হলে ওদের আর কারো আপত্তি থাকবে না। এই মাঝি, এসো!

মাঝি ধীরে ধীরে নৌকাখানা তীরে আনলো।

সমুদ্র আজ শান্ত।

বহু জেলে ছিপ নৌকা নিয়ে সমুদ্র বুকে মাছ শিকার করছে।

ইশরাৎ জাহান আর মাহমুদা নৌকায় উঠে পড়লো।

আহসান নৌকায় উঠে পড়েই হাত বাড়ালো— আসুন মিসেস মনিরা, আমার হাত ধরে উঠে আসুন।

আমি নিজেই উঠে পড়তে পারবো আহসান সাহেব। মনিরা উঠে পড়লো কথাটা বলতে বলতে।

সবাই নৌকায় ঠিক ঠিক জায়গায় বসে পড়লো।

মাঝি বললো— নৌকা ছাড়বো সাহেব?

আহসান বললো— হাঁ, ছাড়ো,

মাঝি নৌকা ভাসিয়ে দিলো সমুদ্রবুকে।

নৌকা নিয়ে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়, কাজেই তীর ধরে কিছুদূর অগ্রসর হলো।

মাহমুদা, ইশরাৎ জাহান ও মনিরাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো আহসান।

মাঝির মাথায় গামছা বাঁধা। গায়ে চাদর, চাদরের আঁচল দিয়ে মুখের খানিকটা অংশ ঢাকা। পরনে একটা ধুতি আঁটসাট করে পরা।

মাঝি নৌকা বাইছিলো আর লক্ষ্য করছিলো আহসান এবং তিনজন মহিলাকে। তাদের কথাবার্তার দিকে কান পেতে যেন শুনছিলো সে।

আহ্‌সান বললো— মাঝি, হাত নেড়ে নৌকা চালাও।

মাঝি বললো— সাহেব, এটা তো নদী হয়—সমুদ্র।

তা আমরা জানি না, তুমি আরো গভীর জলে নিয়ে চলো।

আপনারা যদি হুকুম দেন তাহলে আরো গভীর জলে নিতে পারি। কিন্তু হঠাৎ যদি ডুবে যায়......সাহেব, আপনারা সাঁতার জানেন তো?

আহ্‌সান বলে উঠলো— আমরা কি তোমাদের মত ছোটলোক যে সাঁতার জানবো? সাঁতার কাটে যতসব ছোটলোক। ভদ্রলোক সাঁতার জানে না, বুঝলে?

তাহলে যে গভীর জলে নৌকা নিতে বলেন?

তা যা হয় তবে, তুমি গভীর জলে চলো। অল্প জলে আনন্দ নেই। কি বলেন মিসেস মনিরা?

মনিরা বললো—আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে।

মিস মাহমুদা, আপনারও কি ভয় হয়?

মাহমুদা পূর্বের চেয়ে অনেক স্বচ্ছ হয়ে গেছে আহ্‌সানের কাছে। বললো— আপনার মত অত ভয় আমার নেই।

চমৎকার কথা!

ইশরাৎ জাহান বলে উঠলো—তোমরা দু'জন যাও। আমরা কিন্তু বেশি জলে যাবে! না

মাঝি তখন নৌকাখানাকে বেশ গভীর পানিতে নিয়ে এসেছে। চারিদিকে সমুদ্রের উচ্ছল জলরাশি ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে নৌকার গায়ে।

আহ্‌সান এপাশ থেকে উঠে মনিরার পাশে এসে বসলো। মনিরা সরে বসার চেষ্টা করলো কিন্তু ওদিকে জায়গা না থাকায় সরে বসতে পারলো না সে। আহ্‌সান বললো— মিসেস মনিরা, হঠাৎ যদি নৌকাখানা তলিয়ে যায়...........

না না, ও কথা আপনি বলবেন না মিঃ আহ্‌সান।

ইশরাৎ জাহান বললো— ভাইয়া, তুমি সাঁতার জানো না অথচ নৌকা তলিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছো?

সত্যি ইশরাৎ, আজকের দিনটা আমার কাছে স্মরণীয় দিন হয়ে থাক্, এই আমি চাই।

মাহমুদা বললো— আমার কিন্তু বড্ড ভয় করেছে— কি ভয়ঙ্কর ঢেউগুলো!

আহসান মিছামিছি দোল দিলো নৌকায়।

সবাই পড়তে গিয়ে এ-ওকে জড়িয়ে ধরলো।

আহসান পট্ করে ধরে ফেলে মনিরাকে।

মনিরা তাড়াতাড়ি সংযত হয়ে বসে বলে— মাফ করবেন।

আহসান হেসে বলে— দোষটা আমারই, কাজেই আপনি আমাকে মাফ করবেন মিসেস মনিরা।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে।

মাঝি বলে— সাহেব, এবার নৌকা ফেরাবো?

আহসান বলে উঠে— না না, আরও কিছুক্ষণ থাকো।

মনিরা বলে— না, আর দেরী করা উচিত নয়। হঠাৎ কোনো বিপদ আপদ ঘটতে পারে।

ইশরাৎ বলে— হাঁ ভাইয়া, এবার ফেরা যাক।

মাহমুদাও বলে— আমারও কিন্তু থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কারো যখন মন নেই তখন আহসান বললো— মাঝি, নৌকা ফেরাও।

সমুদ্রতীরে নৌকা ভিড়লো।

অন্ধকার ক্রমেই জমাট বেঁধে উঠছে।

আহসান একজন একজন করে সবাইকে হাত ধরে নামিয়ে নিলো।

মনিরা কিন্তু ইতস্ততঃ করছিলো।

আহসান বললো— আসুন আমি আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি।

অগত্যা মনিরা আহসানের হাতে হাত রেখে নেমে পড়লো।

আহসান মনে মনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

মাঝি দাঁড়িয়ে ছিলো নৌকার এক পাশে। গায়ের চাদরখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলো।

আহসান পকেটে থেকে মানিব্যাগ বের করে বলে— মাঝি, তোমাকে কত দিতে হবে?

মাঝি মাথার গামছাটা ঠিক করে নিয়ে বলে— যা ভাল মনে করেন তাই দেন সাহেব। আমরা গরিব মানুষ.......

ক'ঘণ্টা নৌকা বেয়েছো মাঝি?

আমাদের তো ঘড়ি নেই সাহেব।

ইশরাৎ বললো— আন্দাজ তিন ঘন্টা আমরা ওর নৌকায় ছিলাম।

মানিব্যাগ থেকে আহসান দশ টাকার একখানা নোট বের করে মাঝির দিকে বাড়িয়ে ধরলো— নাও।

মাঝি আহসানের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে সেলাম করলো — সাহেব আবার আসবেন তো!

আহসান খুশি হয়ে বললো— এরা যদি রাজি হন আমিও আসবো এদের সঙ্গে। বলো ইশরাৎ রাজি আছো?

ইশরাৎ তাকালো মনিরার দিকে— কিরে, আসবি নাকি আবার?

মনিরা জবাব দেবার পূর্বেই আহসান বলে উঠে— মাঝির যখন এত সখ তখন আসতে হবেই মিসেস মনিরা, বলুন রাজি?

মনিরা হঠাৎ বলে বসলো —রাজি।

থ্যাঙ্ক ইউ.......... আনন্দ ধ্বনি করে উঠে আহসান।

আহসান ওদের নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

মাঝির মুখে ফুটে উঠে একটা অদ্ভুত হাসির রেখা। এগিয়ে যায় ওদিকের ছোট নৌকাখানার দিকে, ও নৌকার বেচারী মাঝিটা বসে আছে, হয়তো সারাটা দিন কোনো ভাড়া তার ভাগ্যে জোটেনি। মাঝি ওর হাতে দশ টাকার নোটখানা গুঁজে দেয়— নে, বাড়ি যা।

ছোট নৌকার মাঝি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বড় নৌকার মাঝিটার দিকে।

❑

দরবার কক্ষে সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট স্বয়ং দস্যু বনহুর। তার পাশে দণ্ডায়মান রহমান। অন্যান্য অনুচর দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র ঝকমক করছে। দেহে জমকালো পোশাক, এক একজনকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

বনহুর আদেশ করলো —কোথায় সেই নর শয়তানের দল?

রহমান একনজকে ইংগিত করলো— ওদের উপস্থিত করো।

কয়েকজন অনুচর কয়েকজন লোককে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় সেখানে হাজির করলো।

বনহুর তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বন্দী লোকগুলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে দেখলো। দেহে মূল্যবান স্যুট, সবাই প্রায় বয়স্ক। এক-এক জনকে জীবন্ত শয়তান বলে মনে হচ্ছে যেন।

বনহুরের নির্দেশে বন্দীদের হাত এবং মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো।

বন্ধনমুক্ত হওয়ায় লোকগুলো যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কিন্তু তাদের মুখমণ্ডলে ভীতির ভাব ফুটে উঠেছে। বনহুরের দিকে তাকাচ্ছে তারা ভয়াতুর দৃষ্টি মেলে।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—এদের পরিচয়?

রহমান এগিয়ে এলো, প্রথম ব্যক্তিকে সম্মুখে টেনে এনে বললো—সর্দার, ইনি রায়হান বন্দরের মালবাহী একশ' জাহাজের মালিক হোসেন কিবরিয়া। ইনার জাহাজগুলো সবসময় চোরামাল বোঝাই হয়ে দেশ-বিদেশে চালান যায়। চোরামাল বিদেশে রপ্তানি করে তাঁর মাসিক আয় প্রায় তিন কোটি টাকা।

বনহুর একটু হেসে বললো—একশ' জাহাজের মালিক, মাসিক মাত্র তিন কোটি টাকা আয়? এই সামান্য আয়ে উনার চলে কি করে? রহমান, উনার আরও কিছু বেশি আয়ের ব্যবস্থা করে দাও। হাঁ তারপর?

রহমান আর একনজকে টেনে আনলো সম্মুখে—ইনি একজন সরকারি কন্ট্রাক্টর। সরকারের বহু দালান-কোঠা এবং সেতু তৈরির কাজ ইনি গ্রহণ করে থাকেন। সরকারের বহু অর্থ উনি পান, ব্যয় করেন তার সিকি। সর্দার, হিন্দ নদীর সেতু তৈরিও ইনিই করেছিলেন।

বনহুর বললো— হিন্দ নদীর সেতু এই মহাত্মার দ্বারা তৈরি হয়েছিলো? চমৎকার রহমান?

বলুন সর্দার

হিন্দ নদীর সেতু ধসে পড়ে গত বছর কত লোক প্রাণ হারিয়েছিলো?

প্রায় নয়'শ।

তারা কোনো এক উৎসব সেতুবক্ষে পালন করতে গিয়ে সেতু ধসে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলো, তাই নয় কি?

হাঁ সর্দার।

বনহুর এবার কন্ট্রাক্টরকে লক্ষ্য করে বললো—এই সেতু তৈরি ব্যাপারে আপনি কয় লাখ আত্মসাৎ করেছিলেন কন্ট্রাক্টর সাহেব?

ভয় বিবর্ণমুখে মাথা নিচু করে রইলো কণ্ট্রাক্টর হানিফ চিশতী? এতদিন তিনি কণ্ট্রাক্টরীতে কোটি কোটি টাকা লাভ করেছেন। গাড়ি-বাড়ি-ঐশ্বর্য করেছেন। আজ তাকে স্বয়ং দস্যু বনহুরের নিকটে জবাবদিহি করতে হবে, কোনদিন ভাবেননি।

কয়েকদিন পূর্বে পত্রিকায় তাঁরা দস্যু বনহুরের মৃত্যু বিভীষিকার নির্মম অবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন এবং সংবাদ পড়েছিলেন, তবু তাঁরা সাবধান হননি। ভেবেছিলেন, দস্যু বনহুর তাদের সন্ধান পাবে না। গোপনে নিজেদের কাজ ঠিকমতই চালিয়ে চলেছিলেন।

কিন্তু তাঁদের অসাধু, অসৎ ব্যবসা যে এমনভাবে দস্যু বনহুরের কাছে প্রকাশ হবে এবং তাঁরা বন্দী হয়ে হাজির হবেন দস্যু বনহুরের দরবারে এ কথা তাঁদের কল্পনাও আসেনি কোনোদিন।

আজ একেবারে নাজেহাল-পেরেশান হয়ে পড়েছেন তাঁরা। বনহুরের কথায় কি জবাব দেবেন ভেবে পান না কণ্ট্রাক্টর হানিফ চিশতী।

ততক্ষণে রহমান আর একজনকে সম্মুখে টেনে নিয়ে আসে — সর্দার, এই লোক ছেলেধরাদের দলপতি, আমরা বহু দিন ধরে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে একে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি।

দস্যু বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো— এই সেই মহান ব্যক্তি? ইসমাইল সিরাজী?

হাঁ সর্দার, এর নামই ইসমাইল সিরাজী। দেশের বহু বাবা মাকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে বহু শিশুকে এই নর-শয়তান উধাও করেছে।

ঠিকই বলেছো রহমান, আজকাল রেডিওতে প্রায়ই শোনা যায় ছেলে নিখোঁজ সংবাদ, পত্রিকায় দেখা যায়, কিন্তু কোনো সময় তাদের ফিরে পেলো কিনা জানা যায় না। আমি পাকিস্তানের একদল ছেলেধরাকে আবিষ্কার করেছিলাম এবং তাদের সমুচিত শাস্তিও দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ স্বস্তি পাইনি। কারণ, নিজ হাতে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়নি। রহমান, ঐ ব্যক্তির পরিচয় কি জানাও? বনহুর শেষ ব্যক্তিটিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো।

রহমান বললো— সর্দার, এ ব্যক্তি হীরাঝিল নাচঘরের মালিক। এই নাচঘরে প্রতিরাতে বহু লোক নিজেদের সর্বনাশ করে থাকেন।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—হীরাঝিল?

হাঁ সর্দার।

কি নাম এর?

রতন দেওয়ান সিং।

বাস্...... বনহুর আসন ত্যাগ করে নেমে এলো বন্দীদের সম্মুখে, বজ্রকঠিন কণ্ঠে বললো— আপনারা আমার কাছে কি রকম শাস্তি গ্রহণে মৃত্যু কামনা করেন?

বনহুরের কথা শুনে বন্দীদের মুখ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, ভয়-কাতর চোখে তাকাতে লাগলেন তাঁরা দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর রহমানকে বললো—এদের শাস্তি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করা। তার পূর্বে প্রত্যেকের চোখ অন্ধ করে দেবে।

বনহুরের আদেশমাত্র সূতীক্ষ্ম ধার সরু ছোরা হাতে এগিয়ে এলো দু'জন অনুচর।

শিউরে উঠলেন বন্দীরা।

কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করলেন।

বনহুর বললো— সবার চোখ অন্ধ করে দেবার পূর্বে মহাত্মা ইসমাইল সিরাজীর হাত দু'খানা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলো।

সঙ্গে সঙ্গে একজন একটি বিরাট তীক্ষ্ম খর্গ হাতে এগিয়ে এলো।

আর্তনাদ করে উঠলো ইসমাইল সিরাজী—ওরে বাবা, বাঁচাও বাঁচাও আমাকে................

হাঃ হাঃ হাঃ, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর, দাঁতে দাঁত পিষে বললো—কে বাঁচাবে? যাদের ছেলে চুরি করে ব্যবসা চালিয়েছিলে, তারা? ঐ হাত দু'খানা দিয়ে কত নিঃসহায় শিশুকে তুমি বিদেশে চালান করেছে, কত নিষ্পাপ শিশুকে অন্ধ, পঙ্গু করেছো, কত শিশুকে হত্যা করেছো! শয়তান, আজ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ আসবে না তোমাকে বাঁচাতে। মঙ্গলা, এবার তোমার কাজ শেষ করো।

মঙ্গলা তীক্ষ্মধার খর্গ নিয়ে এগিয়ে এলো।

বনহুর আর দু'জনকে আদেশ করলো ইসমাইল সিরাজীর হাত দু'খানা টেনে ধরতে।

বনহুরের অনুচরগণ আদেশ পালনে উদ্যত হতেই সিরাজী বনহুরের পায়ে বসে পড়লো।

বনহুর পা সরিয়ে নিলো।

এবার সিরাজীর হাত দু'খানা কেটে ফেললো অনুচরগণ। রক্তের বন্যা ছুটলো, মেঝেতে পড়ে গেলো ইসমাইল সিরাজী। অন্যান্য বন্দী দু'হাতে চোখ ঢেকে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলেন। একটু পরে তাদের অবস্থাও ইসমাইল সিরাজীর মত হবে। কেন তাঁরা বনহুরের সাবধান বাণীতে নিজেদের সাবধান করেনি, তখন কেন তাঁরা অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে দস্যু বনহুরের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন? অনুশোচনায় এক একজন মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলেন।

বনহুর বললো— এবার সিরাজীর সম্মুখে এইসব ভদ্রবেশী শয়তানের চক্ষু অন্ধ করে দাও। সব শেষে অন্ধ করবে সিরাজীকে। কারণ সবার চেয়ে বেশি দোষী ঐ ইসমাইল সিরাজী। দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎ যে সব শিশু, এইসব শয়তান তাদের নিয়ে ব্যবসা করে। নাও, শুরু করো........

হোসেন কিবরিয়া মূল্যবান স্যুটসহ বসে পড়েন ভূতলে, বারবার, নাকে খৎ দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন— আমাকে মাফ করো বনহুর, আমি তোমার সাবধানবাণী না মেনে ভুল করেছি।

আজ এখানে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কোনোই ফল হবে না কিবরিয়া সাহেব! কারণ, বিচার তোমাদের শেষ হয়ে গেছে। রহমান?

বলুন সর্দার?

বিলম্ব করো না।

বনহুরের নির্দেশে রহমান তটস্থ হয়ে উঠলো।

এবার এক-একজনকে দু'জন করে অনুচর ধরে ফেললো আর দু'জন তাদের দু'চোখে লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়ে দিলো। সে কি প্রাণফাটা তীব্র আর্তচিৎকার— তার সঙ্গে বনহুরের অট্টহাসি এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করলো দরবারকক্ষে।

কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর— নিয়ে যাও এদের, অন্ধকূপে নিক্ষেপ করো। মৃত্যুর পর প্রকাশ্য রাজপথে ফেলে দিয়ে আসবে।

বনহুরের অনুচরগণ বন্দীদের টানতে টানতে নিয়ে গেলো। রহমান এবং অন্যান্য অনুচর তাদের ঠিক ঠিক জায়গায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো— তোমরা চারজন প্রস্তুত থেকো। আজ রাতে হীরাঝিল নাচঘরে হানা দেবো। আমি জানি, এখানে বহু যুবতীকে আটক করে রাখা

হয়েছে এবং তাদের বাধ্য করা হয়েছে এখানে যারা আসে তাদের মনঃতুষ্টি করতে। এইসব যুবতীকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য।

রহমান বলে উঠলো— সর্দার, চারজন কে কে থাকবে?

যাদের তুমি ভাল মনে করো।

আচ্ছা সর্দার।

হাঁ, রাত দুটোর মধ্যে আমাদের সেখানে পৌঁছেতে হবে। পরে পৌঁছলে কোনো কাজ হবে না, কারণ অনেক শয়তান সেখান থেকে সরে পড়বে। আমি এই নাচঘরের অনেককেই জানি, যারা শুধু সমাজের শত্রু নয়—দেশের শত্রু। দেশের জনগণের বুকের রক্ত নিঃশেষ করে তারা শরাব পান এবং অসহায়া নারীদের নিয়ে আমোদ-আহলাদে মেতে উঠে। তোমাদের সঙ্গে নিচ্ছি এ কারণে যেন কেউ পালাতে না পারে আর অসহায়া মেয়েদের কেউ যেন খোয়া না যায়।

আপনার আদেশ ঠিকভাবে পালন করা হবে সর্দার।

বনহুর এবার দরবারকক্ষ ত্যাগ করলো।

বনহুর যখন দরবারকক্ষ থেকে ফিরে এলো তার বিশ্রাম কক্ষে, তখন নূরী দূর থেকে বনহুরকে লক্ষ্য করছিলো। সহসা বনহুরের সম্মুখে আসতে সাহসী হলো না সে। নূরী তার নিজের কক্ষে এসে জাভেদের দোলনা দোলাতে লাগলো। এমনি বহুদিন নূরী বনহুরের সম্মুখে আসতে সাহসী হয়নি। বনহুর যখন দরবার কক্ষ থেকে ফিরে আসতো তখন নূরী দূর থেকে বনহুরকে লক্ষ্য করতো। যেদিন তাকে প্রসন্ন দেখতো সেদিন নূরী উচ্ছল ঝরণার মত ছুটে আসতো তার পাশে। তবে বেশির ভাগ দিন বনহুর দরবারকক্ষ থেকে ফিরতো ভয়ঙ্কর এক রুদ্রমূর্তি নিয়ে, তখন নূরী বহু চেষ্টা করেও তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারতো না।

আজ নূরী বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারে, তার মনোভাব খুব ভাল নয়। সুন্দর মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম উঠেছে। মাঝে মাঝে অধর দংশন করছিলো সে।

নূরী নিজের কক্ষে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নিজকে ধরে রাখতে পারলো না। জাভেদ ঘুমিয়ে পড়েছে তার ছোট্ট বুড়ো আংগুলটা মুখের মধ্যে পুরে। নূরী জাভেদের ঘুমন্ত মুখে চুমু দিয়ে বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে।

বনহুরের কক্ষের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ায় নূরী। চুপি চুপি লক্ষ্য করে সে বনহুরকে।

কক্ষমধ্যে কঠিন মেঝেতে ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়।

আরও সরে এসে উঁকি দেয় নূরী—এবার দেখতে পায় বনহুর পায়চারী করছে। মুখোভাব তার পূর্বের মতই কঠিন লাগছে। বনহুর, পিছনে হাত রেখে পায়চারী করছিলো আর গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো।

নূরী বুঝতে পারে, বনহুর আজ নিশ্চয়ই কোনো অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করবে। কারণ সে এর আগে দেখেছে, যেদিন বনহুর কোথাও কোনো দুঃসাধ্য কাজে গিয়েছে বা করেছে, সেদিন তাকে এমনি কঠিন মনে হয়েছে। নূরী মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠে, কিন্তু সম্মুখে এগুতে সাহসী হলো না সে।

হঠাৎ পিছনে পদশব্দে নূরী আড়ালে সরে দাঁড়ালো সে দেখতে পেলো, রহমান হন্তদন্ত হয়ে বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করলো।

রহমান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো— সর্দার!

পায়চারী বন্ধ করে থমকে দাঁড়ালো বনহুর, ফিরে দাঁড়ালো রহমানের দিকে।

রহমান বললো—সর্দার, আমাদের জম্বু ঘাটি থেকে আশা ওয়্যারলেসে এইমাত্র কথা বলেছে।

বনহুর অবাক কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—আশা!

হাঁ সর্দার, আশা! আশা জম্বু ঘাটি থেকে ওয়্যারল্যেসে জানিয়ে দিলো, আজ রাতে আপনি যেন হীরাঝিল নাঘচরে হানা না দেন।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কঠিন এবং বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—আশ্চর্য, এ সংবাদ এত দ্রুত আশার কানে কি করে পৌঁছলো। আর সেই জম্বুঘাটিতেই বা আশা কখন পৌঁছে এই সংবাদ ওয়্যারলেসে জানাতে সক্ষম হলো!

সর্দার, আমরাও সেই কথাই ভাবছি। আমাদের দরবার থেকে কি করে একথা বাইরে গেলো আর এই অজ্ঞাত নারীই বা কি করে এত দ্রুত জম্বু আস্তানায় পৌঁছে আমাদের আস্তানায় এ সংবাদ জানলো!

বনহুরের ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তারেখা। ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো— তোমাদের আমি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি, প্রস্তুত হয়েছো?

হাঁ সর্দার, কিন্তু ....

বলো?

আশা আরও জানিয়েছে, হীরাঝিল নাচঘর আজ আপনার জন্য নিরাপদ নয়।

সে দেখা যাবে। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

নূরী লক্ষ্য করতে লাগলো বনহুরকে।

রহমান বিদায় গ্রহণ করতেই বনহুর তার দস্যু-ড্রেস পরে নিলো, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াতেই নূরী তার পিছনে এসে দাঁড়ালো, ডাকলো—হুর!

বনহুর মাথার পাগড়ীটা ঠিক করে নিতে নিতে বললো—উঁ।

অসময়ে কোথায় যাচ্ছো?

নূরী চেটে গেলো একটু পূর্বে শোনা কথাগুলো সে যেন কিছু জানে না, এমনি ভাব টেনে বললো কথাটা।

বনহুর মাথার পাগড়ী ঠিক করে নিয়ে বললো—দস্যু বনহুরের আবার সময়-অসময় আছে নাকি?

তবু কোথায় যাচ্ছো বলবে না?

হীরাঝিল নাচঘরে।

হীরাঝিল? সে তো বহুদূরে?

হাঁ, কান্দাই শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

একটা কথা আমায় বলবে হুর? বনহুরকে শান্তভাবে কথা বলতে দেখে নূরী অনেকটা সাহসী হয়ে প্রশ্ন করে বসলো।

বনহুর বললো— এখন বেশি কথা বলার সময় নেই।

বেশি কথা আমি বলবো না, শুধু জানতে চাই আশা মেয়েটি কে?

এবার বনহুরের মুখোভাব গম্ভীর হলো—আশা!

হাঁ, আশা —কে সে?

আমিও জানি না।

এতবড় মিথ্যা কথা তুমি আমার কাছে বললে?

বিশ্বাস করো, আমিও জানি না কে সেই আশা।

হীরাঝিল নাচঘরে তোমার যাওয়ার জন্য আজ সে নাকি নিষেধ করেছে।

অনেক খবর দেখছি জেনে নিয়েছো।

হাঁ, রহমান যখন তোমার কাছে বলছিলো আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি।

তাহলে তো সব জেনে নিয়েছো? জানো এর শাস্তি কি?

জানি, মৃত্যুদন্ড। কিন্তু এখন পারবে না আমাকে মৃত্যুদন্ড দিতে---

কারণ?

জাভেদের মুখের দিকো তাকিয়ে।

নূরী, দস্যু বনহুর কাউকে ক্ষমা করে না যদি তার অপরাধ অমার্জনীয় হয়। তুমিও রেহাই পাবে না আমার দণ্ড থেকে।

জাভেদের মুখ চেয়েও তুমি আমায় ক্ষমা করবে না তখন?

শত জাভেদও রুখতে পারবে না, কাজেই সাবধান থাকবে সর্বক্ষণ। বনহুরের কন্ঠস্বর গম্ভীর কঠিন।

নূরী মুখ নিচু করে রইলো, মনে মনে অভিমান হলেও সে এ মুহূর্তে কিছু বললো না।

সহসা বাইরে শোনা গেলো সাইরেনের শব্দ। নূরী চমকে উঠলো, কারণ সে জানে এ শব্দ কেন করা হয়। দস্যু বনহুরের দল যখন কোনো যুদ্ধে বা কোনো ধ্বংসলীলায় গমন করে তখন সবাইকে একত্র হবার জন্য এই সংকেতসূচক সাইরেন বাজানো হয়।

বনহুর নূরীকে টেনে নিলো কাছে, চিবুকটা তুলে ধরে ওষ্ঠদ্বয়ে গভীর একটা চুম্বনরেখা এঁকে দিয়ে বললো—খোদা হাফেজ।

নূরীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো কিন্তু চোখ দুটো ছলছল হলো তার, অস্ফূট কন্ঠে সেও উচ্চারণ করলো—খোদা হাফেজ।

ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে বনহুর।

❑

হীরাঝিল নাচঘর।

আলোয় আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। হীরাঝিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা মূল্যবান মোটর গাড়ি। সন্ধ্যায় পথের দু'ধারে ছিলো অগণিত গাড়ি রাত বেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির সংখ্যা কমে এসেছে। তবে যারা গভীর রাতের খদ্দের তাদের অবশ্য এটাই সময়।

শহরে ধনী-মানী নামে যারা পরিচিত তাদের সমাগম হয়েছে এখন—এরা শুধু শরাব পান বা হুইস্কি পানে আসেন না, এরা আসেন এখানে যে তরুণীদের রাখা হয়েছে তাদের নিয়ে আমোদ প্রমোদ চালাতে।

হীরাঝিলের ফটকে বিরাট ঘড়ি।

ঘড়ির কাঁটা ঠিক দুটোর ঘরে এসে গেছে।

তখন হীরাঝিলের নাচঘরে এক তরুণী নেচে চলেছে।

তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে চারপাশে বসে আছে কতগুলো গণ্যমান্য বয়সী ব্যক্তি। সবাই শরাব পানে ঢুলু ঢুলু করছে। এরা এক একজন নর-শয়তান, গরীবের ধন-সম্পত্তি শুষে নিয়ে বড় হয়েছে। কেউবা ঘুষখোর, কেউবা সুদখোর কেউ অসৎ ব্যবসায়ী।

নর্তকীর পায়ের তলায় টাকার স্তূপ জমে উঠেছে।

নর্তকীর নাচ হঠাৎ থেমে যায়।

জমকালো পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি এসে দাঁড়ালো, তার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার।

যারা এতক্ষণ ঢুলু ঢুলু, চোখে নর্তকীর নাচ দেখছিলো, তারা দু'চোখ কপালে তুলে ভয়-বিহ্বল চোখে তাকালো জমকালো মূর্তিটার দিকে।

একজন বললো —কে বাবা তুমি?

আর একজন বললো-আমার মনে হচ্ছে দস্যু বনহুর---

হাঁ চিনেছো! বললো দস্যু বনহুর। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলভার গর্জে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো প্রথম ব্যক্তি।

পরমুহূর্তে দ্বিতীয়জন মুখ থুবড়ে পড়লো।

এই দৃশ্য লক্ষ্য করে পালাচ্ছিলো কয়েকজন।

বনহুর পথ আগলে দাঁড়ালো—খবরদার কেউ এক পা দরজার দিকে এগুবে না। আজ তোমাদের শেষ রাত। কথাটা বলার সাথে সাথেই আর একটা গুলী এসে বিদ্ধ হলো তৃতীয় ব্যক্তির বুকে।

কেউ এতটুকু প্রতিবাদ করতে সাহসী হলো না।

বনহুরের রিভলভার গর্জে উঠতে লাগলো একটি পর একটি করে।

রিভলভারের শব্দে চারিদিক থেকে ছুটে এলো নাচঘরের কর্মচারী এবং বয়-দারওয়ান—কিন্তু আশ্চর্য, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ! নাচ ঘরের মধ্য হতে

ভেসে আসছে পর পর রিভলভারের গুলীর আওয়াজ তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে তীব্র আর্তনাদ।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়ছে দরজায় কিন্তু দরজা একটুও নড়ছে না, মূল্যবান কাঠের তৈরি দরজা লোহার মতই শক্ত হয়ে রয়েছে।

নাচঘরে যখন বনহুরের হত্যালীলা চলেছে তখন রহমান ও আরও তিনজন অনুচর অন্যান্য কামরায় প্রবেশ করে যে সব তরুণীকে এখানে আটক করে রাখা হয়েছিলো তাদেরকে মুক্ত করে দিয়ে বললো—যাও, তোমরা যে যার পিতামাতার কাছে চলে যাও। বিলম্ব হলে বিপদে পড়বে।

তরুণীরা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলো. ভয় পেয়েছিলো ওদের দেখে, কিন্তু পরে যখন দেখলো ওরা তাদের উপর কোনো অত্যাচার বা অশোভনীয় কিছু না করে এই নির্মম নরককুন্ড থেকে রেহাই দিচ্ছে তখন খুশি হলো তারা। কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের এখানে ধরে রাখা হয়েছে। এরা ইচ্ছা করে এখানে কেউ আসেনি. এদের আনা হয়েছে বহু অর্থের বিনিময়ে।

ছাড়া পেয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত যে যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো।

বনহুর যখন হত্যালীলা চালাচ্ছিলো তখন সেই নর্তকী যে একটু পূর্বে নাচ দেখাচ্ছিলো সে ওড়নার আঁচলে মুখের নিচের অংশ ঢেকে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলো।

হত্যালীলা শেষ করে বনহুর নর্তকীর দিকে ফিরে তাকালো, কিন্তু অবাক হলো বনহুর, যেখানে নর্তকীটি দাঁড়িয়েছিলো সে জায়গাটা শূন্য, দেখলো, একটা ছোরা গাঁথা আছে সেখানে।

মেঝের বিক্ষিপ্ত লাশগুলোর দিকে বনহুর একবার তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর সরে এসে ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে। ছোরায় গাঁথা একখানা ভাঁজ করা কাগজ। বনহুর দ্রুতহস্তে ছোরা থেকে কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো হীরাঝিলের নীলাভো উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর নিচে। বিস্ময়ে চমকে উঠলো বনহুর, কাগজখানায় লিখা আছে মাত্র কয়েকটি লাইন—

বনহুর, জানতাম তুমি আমার সাবধান বাণী শুনবে না। তাই আমাকে আসতে হয়েছে। আসলে আজ এ কক্ষে নাচ হবার কথা নয়—হীরাঝিলের এক নম্বর নাচঘরে নাচ হবার কথা ছিলো। আজ এক নম্বর ঘরে ম্যারাত্মক গ্যাস ছেড়ে তোমাকে হত্যার প্ল্যান করা হয়েছিলো, কাজেই---তোমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার ফিরে যাও।

"আশা"

বনহুর চিঠিখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। সব যেন কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়,কিন্তু এখন বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই। বনহুর দ্রুত পিছন জানালার শার্সী খুলে পানির পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যায়।

শিস্ দিতেই তাজ এসে দাঁড়ায় নিচে।

বনহুর লাফিয়ে পড়ে তাজের পিঠে।

আরও চারটি অশ্বপৃষ্ঠে বনহুরের চারজন অনুচর এসে দাঁড়ায় তাদের দু'পাশে।

বনহুর অন্ধকারে বলে—কাজ শেষ করতে পেরেছো তোমরা?

সবার হয়ে জবাব দেয় রহমান—হাঁ সর্দার।

বনহুর তাজের তলপেটে পা দিয়ে মৃদু আঘাত করে।

উল্কা বেগে ছুটতে থাকে তাজ।

পিছনে ছুটতে শুরু করে রহমানের অশ্ব দুলকি ও অন্য তিনটি অশ্ব।

❑

এদিকে হীরাঝিলের দুই নম্বর নাচঘরের দরজা তখন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। সবাই একসঙ্গে তীব্র আর্তচিৎকার করে উঠলো, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে সবাই হতভম্ব, আতঙ্কে শিউরে উঠলো—কেউবা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। যে দৃশ্য তারা দেখলো তা বর্ণনাতীত। হীরাঝিলের দুই নম্বর নাচঘরের মেঝের গালিচার চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে উঠেছে। সে এক বীভৎস নৃশংস দৃশ্য!

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করা হলো।

কান্দাই-এর হীরা জেলার পুলিশ সুপার ইব্রাহিম লোদী পুলিশ ইন্সপেক্টার হাবিব আহমদসহ ছুটলেন হীরাঝিল নাচঘরের উদ্দ্যেশ্য। সেখানে পৌঁছে যে দৃশ্য তাঁরা দেখলেন তাতে জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলেন। হীরাঝিলের দুই নম্বর নাচঘরের মেঝেতে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত কতকগুলো দেহ। মেঝেয় যেন রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে।

প্রত্যেকটা লাশের বুকে পিঠে পাঁজরে গুলী বিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন বিদ্যমান। এর পূর্বে কোনোদিন এমন হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

কয়েকদিনপূর্বে হীরাঝিলের মালিক রতন দেওয়ান সিং হঠাৎ উধাও হয়েছে—কোথায় গেছেন কেউ জানে না। কান্দাই শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার মনে একটা বিরাট আশঙ্কা দোলা জাগিয়েছে, একটা বিপুল ভয় সবাইকে স্তম্ভিত করে তুলেছে—নিশ্চয়ই এ দস্যু বনহুরের কাজ।

শুধু হীরাঝিলের মালিক নন, রায়হান বন্দরের মালবাহী জাহাজের মালিক হোসেন কিবরিয়া শহরের সবচেয়ে বড় নামকরা কন্ট্রাক্টর হানিফ চিশতী এবং আরও একজন নামকরা লোক ইসমাইল সিরাজী শহর থেকে হঠাৎ উধাও হয়েছেন। পুলিশ মহল অনেক সন্ধান করেও এঁদের কোনো খোঁজ পায়নি।

এইসব মহাত্মার নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে শহরে যখন দারুণ উৎকুণ্ঠা দেখা দিয়েছে, তখন হীরাঝিল নাচঘরে হলো এই বীভৎস হত্যাকান্ড।

অবশ্য হীরাঝিলের দুষ্ট ম্যানেজার আন্দাজেই ধরে নিয়েছিলো, তাদের মালিককে দস্যু বনহুর ধরে নিয়ে গেছে এবং আজ রাতেই আবার হানা দিতে পারে। সেই কারণেই ম্যানেজার হীরাঝিল নাচঘরের সবচেয়ে সুন্দর-সুসজ্জিত এক নম্বর নাচঘরে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবস্থা করেছিলো। যে মুহূর্তে দস্যু বনহুর হানা দেবে সেই মুহূর্তে গ্যাস পাইপের মুখ খুলে দেবে, কিন্তু সে আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়েছিলো আশা।

আশা জানতে পেরেছিলো হীরাঝিলের ম্যানেজারের গোপন অভিসন্ধির কথা। নারী হলেও তার বিচরণ ছিলো সর্বত্র, বনহুরের দরবারেও সে আত্মগোপন করে বনহুরের সবকিছু জেনে নিয়েছিলো এবং বনহুরের জম্বু ঘাটি থেকে তাকে জানিয়েছিলো। সে যেন আজরাতে হীরাঝিলে হানা না দেয়।

বনহুর যখন রহমানের মুখে জানতে পারলো আশার সংকেত বাণীর কথা তখন বনহুরের ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো, মনে প্রচণ্ড একটা প্রশ্ন নাড়া দিয়েছিলো তার—কে সেই 'আশা যে তার দরবারের গোপন আলোচনার কথাও জেনে নিয়েছে?

বনহুরকে তার সংকল্প থেকে কেউ কোনোদিন রুখতে পারেনি, আজও পারেনি আশার সাবধানবাণী তাকে ক্ষান্ত করতে। আশা দূর থেকেই ভালবাসতো বনহুরকে তার কাছে মনে হতো—এই পৃথিবীর মধ্যে একটি পুরুষই আছে, যার সঙ্গে তুলনা হয় না কোনো পুরুষের।

আশা যখন বুঝতে পারে বনহুর আসবেই হানা দিবেই হীরা ঝিলে তখন সে নর্তকীর ছদ্মবেশে কক্ষ পরিবর্তন করে দুই নম্বর নাচঘরে সবাইকে আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। আশা আরও জানতো, বনহুর কাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হীরাঝিলে গমন করবে।

বনহুরের আগমন আশাতেই অপেক্ষা করছিলো আশা। মনোরম ভঙ্গীতে সে নৃত্য পরিবেশন করে সবাইকে আকৃষ্ট করে রেখেছিলো।

বনহুর যখন অসাধু শয়তান ব্যক্তিগণকে একটির পর একটি হত্যা করে চলেছিলো তখন আশা নির্বাক দৃষ্টি মেলে দেখছিলো বনহুরকে--দেখছিলো বনহুরের এক অদ্ভুত রূপ।

বনহুরের নৃশংস হত্যালীলা থেকে হীরাঝিলের ম্যানেজারও বাদ যায়নি, তাকেও বনহুর হত্যা করেছে।

পুলিশ মহল যখন হীরাঝিলের মৃত্যু বিভীষিকা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে পড়েছে তখন রাজপথের বুকে একদিন পাওয়া গেলো হীরাঝিলের মালিকের মৃতদেহ।

পরদিন পাওয়া গেলো আর একজনের মৃতদেহ—সে হলো ইসমাইল সিরাজী। এক এক করে প্রত্যেকটা মহাত্মার লাশ বিভিন্ন রাজপথে পাওয়া গেলো।

সবাই বুঝতে পারলো এরা সবাই দস্যু বনহুরের শিকার।

এমন হত্যাকান্ড কোনোদিন সংঘটিত হয়নি কান্দাই শহরে। সমস্ত দেশব্যাপী একটা ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। এবার সবাই ন্যায়নীতি মেনে চলতে লাগলো। যারা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতো তারা নিজ নিজ ব্যবসা ত্যাগ করে সৎপথে অর্থ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করতে শুরু করলো।

সব সময় ভয় কখন কে উধাও হবে, পরে পাওয়া যাবে তার বিকৃত লাশ। যারা অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ধনবান ঐশ্বর্যবান হয়েছেন তারা সাধু বনে গরিব ও দুঃখীদের মধ্যে অর্থ এবং ঐশ্বর্য দান করতে লেগে যায়।

প্রত্যেকটা কাজে প্রত্যেকটা ব্যক্তি সর্বক্ষণসজাগভাবে চলাফেরা করতে লাগলো। যারা বড় বড় কোম্পানীর মালিক তারা নিজ নিজ কোম্পানীর কর্মচারী এবং শ্রমিকদের প্রতি খেয়াল রাখলেন কেউ যেন কোনো অসৎ কাজে লিপ্ত না হয়।

কন্ট্রাক্টারগণ এবার ন্যায্যভাবে কাজ করে যেতে লাগলেন। যে সব সরকারি দালান-কোঠা বা পুল-সেতু হসপিটাল অফিস আদালত তৈরি

হচ্ছিলো সব খাঁটি সিমেন্ট এবং চুনবালি দ্বারা তৈরি করতে লাগলেন। পয়সার লোভ সামলে নিলো সবাই প্রাণের ভয়ে।

শুধু জনসাধারণ নয়, পুলিশ অফিসার যাদের ঘুষ খাওয়া নেশা তারাও মহৎ হতে বাধ্য হলেন। হঠাৎ কেউ মোটা ঘুষ দিতে এলে শিউরে উঠেন হাতজোড় করে মাফ চেয়ে ঘুষদাতাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন।

একমাত্র দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসীর মধ্যে এলো এক বিরাট পরিবর্তন।

❑

সমস্ত কান্দাই শহরে যখন দস্যু বনহুরের মৃত্যু বিভীষিকার এক তাণ্ডবলীলা চলেছে তখন একরাতে দস্যু বনহুর উপস্থিত হলো চৌধুরী বাড়িতে। গভীর রাতে সকলের অজ্ঞাতে সে হাজির হলো মনিরার কক্ষে।

মনিরা স্বামীকে পেয়ে আনন্দিত না হয়ে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো কিন্তু মনিরার রাগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। বনহুরের হাস্যোজ্জ্বল মুখ তার মন থেকে ধুয়ে-মুছে নিয়ে গেলো সব অভিমান। এই মুহূর্তে কে বলবে এই সেই বনহুর যার বজ্রকঠিন কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয় নর-শয়তানদের বুকের রক্ত, যার অংগুলি হেলনে শত শত দস্যু মৃত্যুমুখে ঝাপিয়ে পড়তে পারে, যার রিভলভারের গুলী বিনা দ্বিধায় বিদ্ধ হয় নরপিশাচদের বুকে, সেই দস্যু বনহুর করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে মনিরার কাছে বলে—যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে মোরে ক্ষমা করো দেবী---

বনহুরের বলবার ভঙ্গী দেখে মনিরা না হেসে পারে না, বলে—এত শয়তান হয়েছো তুমি?

ভুল করলে মনিরা শয়তান আমি নই---বলো শয়তান দমনকারী। এখন বলো—মাহমুদার জন্য কত দুর কি করলে?

বলবো না, এতদিন এলে না কেন?

সবতো পত্রিকায় দেখেছো। দেশের কতকগুলো বিষাক্ত আবর্জনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলাম, তাই ব্যস্ত ছিলাম অনেক।

তোমার কি এ রক্তের নেশা কোনোদিন মিটবেনা?

নেশা নয়, বলো পিপাসা। যতদিন দেশের বুকে, সমাজের বুকে ন্যায়নীতি মজবুত না হবে ততদিন আমার এ সংগ্রাম চলবে। মনিরা তুমি আমাকে শাসন করো কিন্তু আমার কাজে বাধা দিও না।

মনিরা নীরব থাকে কোনো জবাব দেয় না সে স্বামীর উক্তির।

বনহুর এবার বলে—বলো মনিরা, তোমার এদিকের খবর কি? কোনো বর পেলে?

মনিরা ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসে। একটু গম্ভীর হয়ে বলে সে—আমি কি তোমার মত নানা কাজে মেতে থাকি যে বর পাবো না? পেয়েছি—খুব সুন্দর বর।

বাঃ তাহলে তো কথাই নেই। বর দেখাবে না আমাকে?

নিশ্চয়ই দেখাবো। যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে?

বনহুর ভ্রুকুঁচকে বলে—কিন্তু জানোতো আমার পক্ষে তাকি সম্ভব হবে?

কেন হবেনা, আমি তোমাকে ঠিক নিয়ে যাবো।

কোথায় নিয়ে যাবে?

ইশরাৎ জাহানদের বাড়িতে।

কে সে?

আমার বান্ধবী। ইশরাৎ জাহানের বড় ভাই আহসানই তো মাহমুদার ভাবী স্বামী।

চমৎকার নাম, আহসান। হাঁ, যাওয়া যায় কিন্তু তোমার বান্ধবীর বাড়ি নয়--

তবে কোথায়? হাঁ ঠিক মনে পড়েছে, এখানে দাওয়াত দিলে কেমন হয়?

ভাল হয় কিন্তু অসুবিধাও আছে, কারণ পুলিশ মহল সর্বক্ষণ আমাকে সন্ধান করে ফিরছে। শুধু পুলিশ মহল নয়, জনসাধারণ সবাই খুঁজে ফিরছে আমাকে, কারণ জানোতো এখন আমার মূল্য এক লাখ টাকা। চৌধুরী বাড়ির চারিদিকে সব সময় পুলিশ সতর্ক পাহারা রয়েছে।

তাহলে তুমিই বলো কিভাবে তাকে দেখবে?

এক কাজ করো, আমি হবো তোমার গাড়ির ড্রাইভার।

তারপর?

তারপর তোমার বান্ধবী এবং বান্ধবীর ভাই আহসানকে দাওয়াত করবে পিকনিকে যাবার--

তারপর?

তখন আমাকে চিনলো না কেউ, জানলো না কেউ অথচ আমি তোমার বান্ধবীর সেই আদুরে ভাইজানকে দেখে নিলাম ভাল করে বাস্।

ঠিক বলেছো।

হাঁ, কাল ভোরে তোমার গাড়ির ড্রাইভারকে বিদায় করে দিও অবশ্য কয়েক দিনের ছুটি দিয়ে দিও তাকে।

বেশ, তাই হবে। বললো মনিরা।

❑

মনিরাকে লক্ষ্য করে বললেন মরিয়ম বেগম—ড্রাইভারকে অমন করে ছুটি দিলি কেন মনিরা?

একটু হেসে বললো মনিরা—নতুন একটা ড্রাইভার পেয়েছি তাই।

নতুন ড্রাইভার।

হাঁ মামীমা।

দশ বছরের পুরানো ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে---

একেবারে তাড়িয়ে দেইনি। বেচারী বহুদিন থেকে ছুটি চায় পায় না, কারণ ভাল ড্রাইভারের অভাবে ওকে ছুটি দেওয়া হয়নি, এবার আর একটি ভাল ড্রাইভার পেয়েছি।

কি জানি বাবা কোথাকার কে! বিশ্বাসী কিনা তাই বা কে জানে।

তুমি কিচ্ছু ভেবো না মামীমা, ড্রাইভারটা খুব বিশ্বাসী। তুমি দেখবে?

কই, এসেছে?

হাঁ, না এলে কি আর পুরানো ড্রাইভারকে ছুটি দেই? এবার মনিরা ফুলমিয়াকে ডেকে বললো—ওরে ফুলমিয়া যা তো নতুন ড্রাইভারকে ডেকে আন্।

যাচ্ছি আপামনি।

না থাক্, আমিই যাচ্ছি। তুই যা কাজ করগে।

মরিয়ম বেগম বললেন—চল্ আমিও তোর সঙ্গে যাই, দেখি কেমন ড্রাইভার রাখলি।

মনিরা আমতা আমতা করে বললো—তুমি আবার কষ্ট করে যাবে?

তাতে কি চল্। মরিয়ম বেগম পা বাড়ালেন।

মনিরা তখন একটু বিব্রত হলো, ফুলমিয়াকে লক্ষ্য করে বললো—ফুলমিয়া নতুন ড্রাইভার কি করছে?

ফুলমিয়া চলে যাচ্ছিলো, ফিরে দাঁড়িয়ে বললো—নতুন ড্রাইভার গাড়ি পরিষ্কার করছে।

এবার যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলো মনিরা, মামীমাকে লক্ষ্য করে বললো—চলো মামীমা, নতুন ড্রাইভারকে দেখবে চলো।

মনিরা আর মরিয়ম বেগম গ্যারেজের দিকে এলো।

মনিরা নিজস্ব গাড়ির গ্যারেজ অন্দরমহল সংলগ্ন নির্দিষ্ট জায়গায় ছিলো, প্রাচীর-ঘেরা বাগানবাড়ির পাশে সুন্দরভাবে তৈরি এই গ্যারেজ।

মনিরা আর মরিয়ম বেগম এসে দাঁড়ালো—তারা দেখতে পেলো ড্রাইভার মনোযোগ সহকারে গাড়ি পরিষ্কার করে চলেছে। কোনো দিকে তার যেন খেয়াল নেই।

মনিরা মনে মনে হাসছিলো।

মরিয়ম বেগম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন, তারপর বললেন—লোকটা বেশ কাজের মনে হচ্ছে।

মনিরা বললো—হাঁ, অত্যন্ত কাজের, সেইজন্যইতো আমি ওকে পছন্দ করেছি। কিন্তু মামীমা ওর সম্মুখে যেন ওর প্রশংসা করোনা, বেশি লাই পেয়ে যাবে।

মরিয়ম বেগম হেসে বললেন—যে কাজের লোক হয় সে কোনো সময় মন্দ হয় না মা। তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললেন —ড্রাইভার!

ফিরে তাকালো ড্রাইভার, মনিরা আর মরিয়ম বেগমকে দেখতে পেয়ে সালাম জানালো সোজা হয়ে।

মরিয়ম বেগম দেখলেন, মাথায় পাগড়ী বাঁধা মুখে ছাঁটা দাড়ি চোখে কালো চশমা। পরনে পাঞ্জাবীদের মত ঢিলা কুঁচিদার পা-জামা আর লম্বা পাঞ্জাবী।

মরিয়ম বেগম বললেন—ড্রাইভার তোমার কি চোখ খারাপ আছে?

জ্বি?

তোমার কি চোখ খারাপ?

থোরা থোরা খারাব আছে মাইজি।

সর্বনাশ, গাড়ি চালাতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে নাতো

নেহি মাইজি হামি বহুৎ দিন সে গাড়ি চালাতা।

মনিরা মৃদু হেসে বলে—মামীমা, তোমাকে তো বলেছি, এই ড্রাইভার অত্যন্ত পাকা ড্রাইভার।

হাঁ, মাইজি, হামি বহুৎ আচ্ছা ড্রাইভার।

তা দেখা যাবে। কয়েকদিন কাজ করলেই বুঝতে পারবো। আচ্ছা তোমার নাম কি বাবা?

নাম?

হাঁ।

হামারা নাম ফরমান আলী দেওয়ান--

মনিরা হেসে উঠলো খিল খিল করে।

মরিয়ম বেগম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ছিঃ মা কারো নাম শুনে হাসতে নেই।

ড্রাইভার তখন হাসি চেপে মাথা চুলকাতে চেষ্টা করছিলো কিন্তু মাথায় পাগড়ী থাকায় সে ঘাড় চুলকাতে শুরু করলো।

মরিয়ম বেগম বললেন—তুমি কিছু মনে করোনা ড্রাইভার। বড্ড ছেলেমানুষ ও। চল্ মা মনিরা চল্।

মনিরা এবং মরিয়ম বেগম ফিরে চললো।

মনিরাএকবার ড্রাইভারের সঙ্গে মুখ চেপে হেসে নিলো তারপর মামীমাকে অনুসরণ করলো।

মরিয়ম বেগম বললেন—মনিরা কারো নাম মন্দ হলে তার সামনে মন্দ বললে বা হাসলে ব্যথা পায় সে বুঝলে? আর যেন হেসোনা--

না না, হাসবো না আর। কিন্তু ওর নাম ধরে ডাকবো কেমন করে বলো।

কেন, ফরমান বলে ডেকো।

উঁ হুঁ একেবারে বাজে নাম।

তবে দেওয়ান বললেই পারো।

না, ও নামটাও আমার ভাল লাগছে না ঠিক মনে পড়েছে আগা পাছা বাদ দিয়ে মাঝেরটুকু --আলী বলে ডাকলে কেমন হয়?

ঠিক বলেছো মনিরা আলী নামটা কিন্তু সুন্দর। বেচারী যে ক'দিন থাকে ওকে আলী বলেই ডেকো।

তাই হবে। বললো মনিরা।

মনিরা নিজের ঘরে এসে রিসিভার তুলে নিলো হাতে, ইশরাৎ জাহানের কাছে ফোন করে জানালো তারা যেন তৈরি থাকে, কাল ভোরে পিকনিকে যাওয়া হবে।

ইশরাৎ জাহানতো আনন্দে আত্মহারা হলো, সে তখনই ভাইয়ার কাছে মতামত জেনে নিয়ে মনিরাকে জানিয়ে দিলো, কাল সকালে তারা তৈরি হয়ে যাবে।

❑

পরদিন মাহমুদা আর মনিরা সেজেগুজে তৈরি হয়ে নিলো।

ফুলমিয়া পিকনিকের জন্য যে যে জিনিসপত্রের প্রয়োজন সব গুছিয়ে তুলে দিলো গাড়িতে। অবশ্য ড্রাইভারও ফুলমিয়াকে সাহায্য করলো এ ব্যাপারে।

মাহমুদা আর মনিরা যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলো তখন মরিয়ম বেগম ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললেন—বাছা তুমি নতুন লোক, এদের দেখেশুনে নিয়ে যাবে। সাবধানে গাড়ি চালাবে বুঝলে?

হাঁ মাইজি হাম সম্‌ঝা।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো ড্রাইভার।

এইগাড়িতে একমাত্র মনিরা ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ জানে না ড্রাইভারের আসল পরিচয়।

তবে নূর একদিনের মধ্যেই ড্রাইভারকে ভালবেসে ফেলেছে। বড় আদর করে ওকে ড্রাইভার।

নূর প্রথম দিনই ড্রাইভারের আদরে খুশি হয়ে ছুটে গিয়েছিলো মায়ের কাছে—আম্মি, আম্মি, ড্রাইভারটা খুব ভাল লোক। আমাকে বড্ড আদর করে, কোলে নিয়ে চুমু খায়। আম্মি, কই কিছু বলছো নাতো?

হাঁ বাবা আমাদের নতুন ড্রাইভার খুব ভাল।

আম্মি, আমাকে পাঁচটা টাকা দিও, আমি ওকে বখশীস দেবো।

বেশ দিও।

নাছোড়বান্দা নূর ধরে বসেছিলো—আজকেই দেওনা, আমি ওকে দেই।

আজ না বাবা, আর একদিন দিও। বলেছিলো মনিরা।

ও কথা হবে না, তুমি আমাকে এক্ষুণি টাকা দাও। দাও বলছি নইলে আজ আমি কিছু খাবো না। কথাগুলো বলে মুখ ভার করে বসেছিলো নূর।

মনিরা হেসে বলেছিলো—নাও! পাঁচ টাকার একটি নোট নূরের হাতে দিয়ে দিলো মনিরা।

নূর টাকা নিয়েই ছুটে গিয়েছিলো নতুন ড্রাইভারের কাছে।

ড্রাইভার ওকে কোলে টেনে নিয়ে বলেছিলে—কিয়া বাত ছোটা সাহাব?

এই নাও তুমি মিষ্টি কিনে খেয়ো। ড্রাইভারের হাতে পাঁচ টাকার নোটখানা গুঁজে দেয় নূর।

ড্রাইভার হেসে বলে—নো নো, হামি টাকা কি করিবো ছোটা সাহাব? মিষ্টি হামি খাই না।

তোমার ছেলে নাই?

আছে, ঠিক তোমারই মত এক লাড়কা আছে হামার।

এ টাকা তুমি রেখে দাও, তোমার ছেলেকে মিষ্টি কিনে দিও।

আর হামি তোমাকে যদি মিষ্টি কিনিয়া দেই খাইবে না?

হাঁ খাবো। কিন্তু---

বোলো? বোলো ছোটা সাহেব?

আমাদের অনেক টাকা আছে, তোমার তো অনেক টাকা নেই। তুমি মিছেমিছি আমার জন্য পয়সা নষ্ট করো না।

তুমি মিষ্টি খাইলে হামি বহুৎ খোশ হইবো ছোটা সাহাব।

বেশ এনো, খাবো। ড্রাইভার?

বোলো ছোটা সাহাব?

তোমার ছেলে কেমন দেখতে?

ঠিক তুমার মত হইবে।

ঠিক আমার মত?

হাঁ ছোটা সাহাব।

তোমার ছেলেকে একদিন আনবে?

হামি গরিব মানুষ, তোমার বাড়ি আনলে তুমি ঘৃণা করবে না তো ছোটা সাহাব?

বহুৎ আচ্ছা তুম্ ছোটা সাহাব। তুম্ বহুৎ আচ্ছা---কোলে তুলে নিয়ে আদর করেছিলো ওকে ড্রাইভার।

আজ মনিরা ইচ্ছা করেই নূরকে সঙ্গে নেয়নি, সব সময় সে বিরক্ত করবে ড্রাইভারকে তাই ওকে সরকার সাহেবের সঙ্গে বাইরে পাঠিয়ে ওরা গাড়িতে উঠে বসেছিলো।

ইশরাৎদের বাড়ির গেটে গাড়ি পৌঁছতেই ইশরাৎ জাহান এবং আহসান গাড়িতে উঠে পড়লো। তারা তৈরি হয়ে মনিরাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো।

গাড়িতে বসে শুরু হলো তাদের আলোচনা—কোথায় যাওয়া যায়।

মনিরা বললো সর্বপ্রথম—সমুদ্রের ধারে নির্জন একটা জায়গা বেছে নিলে কেমন হয়?

মাহমুদা সায় দেয়—হাঁ, ঠিক বলেছো আপা, তাই ভাল হবে।

ইশরাৎ জাহান বললো—সেই ভাল, দেশব্যাপী দস্যু বনহুরের যে উপদ্রব চলেছে তাতে দূরে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না।

আহসান চুপ করে ছিলো এতক্ষণ, এবার সে বলে উঠলো—রেখে দাও তোমার দস্যু বনহুর। একবার যদি আমার সম্মুখে সে পড়তো তাকে নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়তাম।

ভ্রুকুঞ্চিত করে বলে উঠে ইশরাৎ জাহান—কি বললে ভাইয়া দস্যু বনহুরকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়বে?

তা নয় তো কি—সেও মানুষ, আমিও মানুষ। কেন, আমার দেহে কি শক্তি নেই?

চুপ করো ভাইয়া, শুনেছি দস্যু বনহুর নাকি অশরীরী আত্মার মত সব শুনতে পারে, দেখতে পারে। বন্ধ কক্ষেও আচম্বিতে প্রবেশ করে হত্যা করতে পারে সে।

এবার আহসান হেসে উঠলো—হঠাৎ এই গাড়ির মধ্যে এসে পড়তে পারে, তাই না?

অসম্ভব কিছুই নয় দস্যু বনহুরের কাছে। বললো ইশরাৎ জাহান।

দুই ভাই-বোন মিলে দস্যু বনহুরকে নিয়ে বেশ কথা কাটাকাটি হচ্ছিলো। ইশরাৎ জাহানের দস্যু বনহুর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা সে জানে, দস্যু বনহুর অসাধ্য সাধন করতে পারে আর আহসান ইশরাৎ জাহানের কথা কিছুতেই মেনে নিতে চায় না, সে বলে দস্যু বনহুরও পুরুষ, আমিও পুরুষ —সে যা পারে কেন আমরা তা পারবো না কেন? আমরা তার কাজে বাধা দিতে পারবোনা শুধু আজ নয়, এমনি বহুদিন দু ভাই বোনের মধ্যে নানারকম তর্কবিতর্ক হয়ে থাকে।

মাহমুদাও মাঝেমাঝে যোগ দেয় ইশরাৎ জাহানের সঙ্গে। সেও জানে না কে এই দস্যু বনহুর, তবু তার মন বলে দস্যু বনহুর সাধারণ মানুষ নয়। সে এক অলৌকিক মানুষ, যার সঙ্গে তুলনা করা যায় না একালের এই পুরুষনামী মানুষগুলোর।

মনিরা অবশ্য সব সময় চুপচাপ থাকতো এ ব্যাপারে। যখন তাকে ওরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বসতো তখন মনিরা দু'একটা জবাব দিতো।

অন্যান্য দিনের মত আজও মনিরা নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো আর মৃদু মৃদু হাসছিলো, কারণ ড্রাইভ আসনে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি, যাকে নিয়ে তাদের এত মাথাব্যথা।

গাড়ি চলেছে।

ড্রাইভার বলে উঠলো—কাঁহা যানে হোগা সাহাব?

হাঁ বলছি— মিসেস মনিরা, আপনিই বলুন কোথায় যাবেন, আপনি যেখানে বলবেন সেখানেই যাওয়া যাবে। কথাগুলো বলে ড্রাইভ আসনের পাশ থেকে পিছন আসনের দিকে ফিরে তাকালো আহসান

মনিরা বললো—দস্যু বনহুরের ভয়ে আমিও কম ভীত নই, কাজেই ইশরাৎ জাহানের সঙ্গে আমার একমত।

উঁ হুঁ, তাহলে আপনার কথায় আমি রাজি নই মিসেস মনিরা। ড্রাইভার, ইরোবন চলো।

ইরোবন! বললো ইশরাৎ জাহান।

হাঁ ইরোবন, কান্দাই-এর একটি সুন্দর মনোরম বন এটা। সুন্দর হালকা বন, কোথাও ঝোপঝাড় বা আগাছা নেই। শুধু বড় বড় শাল আর পাইন গাছ। মাঝে মাঝে মেহগনি এবং চন্দন কাঠের গাছ আছে।

ইশরাৎ জাহান বলে উঠলো— তুমি যাই বলো ভাইয়া— ইরোবনই বলো বা হীরোবনই বলো, হঠাৎ দস্যু বনহুর যদি এসে পড়ে তখন কি করবে শুনি?

এই দেখো, সে বুদ্ধি আমি এঁটেই এনেছি। আহসান পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে দেখালো সবাইকে।

ড্রাইভার হাসলো আপন মনে।

মনিরাও অবশ্য হাসলো কিন্তু সে নিজকে অত্যন্ত সর্তকভাবে গম্ভীর রাখলো। মনিরা স্বীকার হলো আহসানের কথায়— বললো ইরোবন দেখা হয়নি কোনোদিন, ওখানেই যাওয়া যাক।

ধন্যবাদ মিসেস মনিরা, আপনাকে আমি আন্তরিক প্রীতি জানাচ্ছি। ইশরাৎ, দেখলি তো মিসেস মনিরা আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আহসান এবার ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো —ড্রাইভার, ইরোবন চলো।

ড্রাইভার গাড়ির সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো— বহুৎ আচ্ছা।

এবার গাড়িখানা শহরের বিভিন্ন পথ ধরে ইরোবনের দিকে দ্রুত এগিয়ে চললো।

গাড়ির ভিতরে তখন নানারকম গল্পের ফুলঝুরি ঝরে পড়ছে— হাসি-গল্প কত কথা।

একসময় পৌঁছে যায় তারা ইরোবনে।

ড্রাইভার গাড়িখানাকে একটি সুন্দর জায়গা বেছে নিয়ে রাখলো।

গাড়ি থেকে নেমে পড়লো সবাই।

ইশরাৎ জাহান, মনিরা, মাহমুদা মিলে গাড়ির জিনিসপত্র নামাচ্ছিলো।

আহসান বলে উঠে— আহা, তোমরা ব্যস্ত হচ্ছো কেন? ড্রাইভার, জিনিসপত্রগুলো সব নামিয়ে দাও।

বহুৎ আচ্ছা সাহাব। ড্রাইভার গাড়ি থেকে খাবারের জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে নিতে লাগলো।

মনিরা হাসলো।

আহসান দেখিয়ে দিলো— এইখানে সব গুছিয়ে রাখো। দেখো কোনো জিনিস যেন ক্ষতি না হয়।

ড্রাইভার জিভ কামড়ে বললো— নেহি সাহাব, কোই ক্ষতি হামি নাহি করিবো........

মনিরা বললো— ও খুব ভাল লোক, আমাদের কোনো জিনিস ক্ষতি করবেনা।

বলা যায় না, গরিব বয়, বাবুর্চি, দারওয়ান, ড্রাইভার এদের বিশ্বাস কি বলুন?

ইশরাৎ বলে উঠে— ভাইয়া, তুমি বেশি কথা বলছো। মনিরা, এ ড্রাইভারটাকে নতুন মনে হচ্ছে না?

হাঁ, এ নতুন এসেছে। তবে খুব বিশ্বাসী।

ওর মুখ দেখে সে রকমই মনে হয়। কি নাম ওর?

মনিরা ইশরাতের প্রশ্নে জবাব দিলো— ফরমান আলী দেওয়ান।

ওরে বাবা, কি বিদঘুটে নাম! বললো আহসান।

ইশরাৎ জাহান বললো— কেন মন্দ কি!

মনিরা বললো— আমি ওকে আলী বলে ডাকি।

বাস্ সেই ভাল। বললো আহসান। তারপর বললো— ড্রাইভার, তুমি এদিকে সব গুছিয়ে নাও, আমরা বনের মধ্যে ঘুরেফিরে কতকগুলো ছবি তুলে নিই। আসুন মিসেস মনিরা, আসুন মিস্ মাহমুদা.......

কই, আমাকে তো ডাকলে না ভাইয়া? বললো ইশরাৎ জাহান।

ড্রাইভার তখন গাড়ি থেকে খাবারের জিনিসপত্র এনে গুছিয়ে রাখছিলো। ইচ্ছা করেই সে একটা প্লেট ভেঙ্গে ফেললো।

আহসান খেঁকিয়ে উঠলো— সর্বনাশ করেছে। একেবারে অকেজো একটা লোককে আপনি ড্রাইভারের কাজ দিয়েছেন মিসেস মনিরা।

মনিরা বলে উঠলো— ঠিক আছে, ওর মাইনে থেকে প্লেটটার দাম কেটে নেবো।

হাত জুড়ে বলে ড্রাইভার— নেহি আপামনি, হামি বহুৎ গরিব আদমী!

ইশরাৎ জাহান বলে উঠে— মনিরা, তোর কি একটু মায়া নেই? সামান্য দু'টাকার না হয় একটা প্লেট ভেঙ্গেছে, তাই তুই দাম কাটবি?

আহসান বলে উঠলো— কাটবে নাতো কি? এবার যদি মাফ করে দেয় তবে আবার এমনি করে রোজ এটা নয় সেটা নষ্ট করে বসবে।

মনিরা আহসানের কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠে— আপনি ঠিক বলেছেন, একবার ওকে মাফ করলে প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। ড্রাইভার, তুমি বড্ড দুষ্ট হয়েছো।

কি করিবো আপামনি, বুড়া মানুষ, হামার হাতে তাগদ নেই আছে......হাত কচলায় ড্রাইভার।

ইশরাৎ বলে—যাক, এবারের মত মাফ করো। যে প্লেটখানা ভেঙ্গেছে তার দাম আমিই দিয়ে দেবো। চলো! মনিরা আর মাহমুদার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো সে।

তিন বান্ধবী মিলে বনের মধ্যে ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগলো।

আহসান ফটো নিয়ে চললো একটির পর একটি করে।

একসময় মাহমুদা আর ইশরাৎ জাহান সরে গেছে বেশ কিছু দূরে।

মনিরা এগুচ্ছিলো, হঠাৎ তার পায়ে একটা কাঁটা বিঁধে যায়। জুতোর ফাঁকে আংগুলে বিদ্ধ হয়েছিলো কাঁটাটা। বসে পড়লো মনিরা—উঃ!

দ্রুত সরে আসে আহসান—কি হলো মিসেস মনিরা?

কিছু না, সামান্য একটা কাঁটা বিঁধেছে......

দেখি দেখি আমি উঠিয়ে দিচ্ছি।

না, আমি নিজেই উঠিয়ে ফেলতে পারবো।

ততক্ষণে আহসান মনিরার পাশে বসে পড়ে তার পায়ে হাত রেখেছে। বলে আহসান— মিসেস মনিরা, আমি বুঝতে পারি না, আপনি আমার কাছে এত সঙ্কুচিত থাকেন কেন? আপনি জানেন না আমি আপনাকে কত ভালবাসি!

ছিঃ আপনি ভুল করছেন?

না, আমি ভুল করিনি মিসেস মনিরা। কারণ আমি বিদেশ যাওয়ার পূর্ব হতে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি। যখন আপনি ইশরাতের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে যেতেন তখন থেকে আপনার ছবি গেঁথে গেছে আমার হৃদয়পটে।

না না, এসব আপনি কি বলছেন মিঃ আহসান। আমি আপনাকে আমার ছোট বোনের ভাবী স্বামী হিসেবেই জানি......

কিন্তু আমি যে তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না মনিরা, আহসান মনিরার হাত চেপে ধরে।

মনিরা এক ঝটকায় আহসানের হাত থেকে নিজের হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিতেই পিছনে ড্রাইভারের গলার শব্দ শোনা যায়, একটু কাশীর শব্দ।

চমকে ফিরে তাকায় আহসান, ড্রাইভারকে দেখে রাগত কণ্ঠে বলে উঠে—তুমি আবার এখানে কেন এসেছো?

মনিরা তাকায় ড্রাইভারের দিকে, মুখখানা তার দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে মুহূর্তে।

আহসান বলে— যাও, তুমি ওখানে যাও।

ড্রাইভার চলে গেলো।

ততক্ষণে ইশরাৎ জাহান এবং মাহমুদা এসে পড়েছে।

ওরা এসে পড়তেই আহসান বলে উঠে— মিসেস্ মনিরার পায়ে কাঁটা বিঁধেছিলো।

তাই নাকি মনিরা? বললো ইশরাৎ জাহান।

মনিরা বললো— বিঁধেছিলো কিন্তু বেরিয়ে গেছে।

ইশরাৎ জাহান মনিরার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে চিবুকটা তুলে ধরে বললো— ইস্, বড্ড লেগেছে বুঝি?

মনিরা কোনো জবাব দিলো না।

আহ্সান বললো— চলো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।

ইশরাৎ বললো— চলো, অনেক ছুটাছুটি করেছি, বড্ড ক্ষুধা পেয়ে গেছে।

সবাই মিলে তারা এগিয়ে চললো যেখানে খাবার সরঞ্জাম সাজানো ছিলো।

আহসান চারিদিকে তাকিয়ে বললো—ড্রাইভার গেলো কোথায়?

ইশরাৎ জাহান বলে উঠলো— আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, ওর কি সখ হয় না? বেচারী হয়তো একটু ঘুরেফিরে দেখছে।

মনিরা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে কোনো কথা বললো না।

মাহমুদা আর ইশরাৎ জাহান খাবার জিনিসপত্র ঝুড়ি থেকে বের করে প্লেটে সাজাতে শুরু করলো।

আহসান একখানা প্লেট মনিরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো— নিন, খেয়ে নিন মিসেস মনিরা।

মনিরা বললো— ধন্যবাদ, আপনি খান, আমি নিজেই নিয়ে খাচ্ছি। মনিরা একটা প্লেট হাতে তুলে নিলো।

সবাই খেতে শুরু করেছে।

ইশরাৎ খেতে খেতে মনিরাকে লক্ষ্য করে বলে— হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে পড়লি কেন মনিরা! বুঝেছি, হয়তো বন্ধুর কথা মনে পড়েছে?

মনিরা হাসবার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো জাবাব সে দেয় না। যে আহসানকে সে মাহমুদার জন্য পছন্দ করে এতদূর অগ্রসর হয়েছে সেই কিনা তার কাছে প্রেম নিবেদন করে বসলো! মনিরা যেন মাটির সঙ্গে মিশে

যাচ্ছিলো, কত উঁচু মুখ করে সে আহসানকে বেছে নিয়েছিলো, সব যেন নিমিষে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো।

মনিরা ধীরে ধীরে খাচ্ছিলো। অন্য সকলের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় আচম্বিতে তাদের সম্মুখে হাজির হয় অদ্ভুত কালো আলাখেল্লা পরা এক লোক, তার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার, মুখে মুখোস।

বনের মধ্য হতে বেরিয়ে আহসান এবং অন্য সবার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললো আলখেল্লা পরিহিত ব্যক্তি—হ্যান্ডস আপ্!

আহসান নাস্তা শেষ করে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিলো, সম্মুখে চোখ তুলতেই তার হাত থেকে চায়ের কাপ খসে পড়লো। জামা-কাপড়ে চা ঢলে পড়লো। কাঁপতে কাঁপতে হাত উঠালো সে।

ইশরাৎ জাহান, মাহমুদা এরাও হাত তুলেছে উঁচু করে। এক একজনের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

আহসান ঢোক গিলে বললো—কে তুমি? কি চাও?

দস্যু বনহুর!

এ্যা তুমি...তুমি দস্যু বনহুর?

হাঁ, বের করো তোমার কাছে কি আছে।

আমার কাছে কিছু নেই— টাকা-পয়সা সামান্য কিছু আছে— তা সব দিচ্ছি, প্রাণে মেরো না। কথা বলার ফাঁকে তাকাচ্ছে আহসান চারিদিকে, ভাবছে এ মুহূর্তে ড্রাইভারটা এলেও তবু কিছুটা সাহস হতো।

দস্যু বনহুর পুনরায় গর্জে উঠলো—হাত নিচু করে পকেট থেকে সব বের করে ফেলো। খবরদার চালাকি করতে যেও না, মরবে।

আহসান কম্পিত হস্তে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বাড়িয়ে ধরলো— এই নাও।

ওটা ছাড়া আর কি আছে বের করো।

আর কিছু নেই!

মিথ্যা কথা, তোমার কোটের পকেট উঁচু লাগছে বের করো যা আছে।

এবার আহসান বাধ্য হলো পকেট থেকে তার পিস্তলখানা বের করতে।

বনহুর বললো— ওটা ঐ পাশের ডোবায় ছুঁড়ে ফেলে দাও।

আহসান মায়াভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তার সখের পিস্তলটার দিকে।

বনহুর হেসে উঠলো— হাঃ হাঃ হাঃ, কাপুরুষ, ওটা রেখে তুমি কি করবে? ফেলে দাও, ফেলে দাও বলছি......

এবার আহসান ফেলে দিলো অনুগত দাসের মত তার হাতের পিস্তলটা পাশের ডোবার পানিতে। তখন তার মুখোভার বড় অসহায় করুণ লাগছিলো।

মাহমুদা আর ইশরাতের অবস্থাও অত্যন্ত কাহিল, তারা মনে প্রাণে খোদার নাম স্মরণ করছে। এক-একজনের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে।

মনিরা মনে মনে হাসছিলো, বনহুর যে সত্যি সত্যি এখানে এভাবে নিজকে প্রকাশ করবে, সে ভাবতে পারেনি।

আহসান রিভলভার ফেলে দিতেই বনহুর বললো— তোমার মানিব্যাগ উঠিয়ে পকেটে রাখো। আর কোনোদিন যেন মেয়েদের নিয়ে বনে-জঙ্গলে তামাশা করতে এসো না। যাও!

বনহুর বনমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আহসান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

ইশরাৎ জাহান তো কান্না শুরু করে দিয়েছে।

মাহমুদার অবস্থাও তাই।

সবাই বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তাদের ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, তারা যে প্রাণে বেঁচে গেলো এটাই তাদের ভাগ্য। আহসান কম্পিত গলায় ডাকতে লাগলো ড্রাইভার......ড্রাইভার

... কিন্তু তার কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে গেছে, শব্দ বের হচ্ছে না গলা দিয়ে।

হঠাৎ দেখা গেলো ড্রাইভার পাশের একটা গাছের আড়াল থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসছে। সম্মুখে আসতেই আহসান ধমক দিলো— কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

সাহাব হামি উধার গিয়ে ইরোবন দেখনে কে লিয়ে। আনা লাগা তব দেখা এক কালা আদমী......হাম পিছে হট গিয়া... সাহাব উ কালা আদমী কাঁহা?

কালা আদমীর খোঁজ আর নিতে হবে না, শীগ্‌গীর গাড়িতে চলো! বলে আহসান ইশরাৎ জাহানের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

মাহমুদা, মনিরাও দ্রুত ছুটলো গাড়ির দিকে।

ড্রাইভার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে যাচ্ছিলো, আহসান ধমক দিলো— রেখে দাও ওগুলো, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসো। শীগ্‌গীর এসো......

ড্রাইভার দু'চারটে জিনিস হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে এসে চেপে বসলো। তার দেহটাও কাঁপছে থরথর করে।

❑

বনহুরের হাসি যেন থামতে চায় না।

মনিরা মুখ ভার করে বলে—হাসছো যে বড়?

হাসি থামিয়ে বললো বনহুর—হাসবো না তো কি কাঁদবো? বেশ, বেশ, বোনের জন্য পাত্র খুঁজতে গিয়ে নিজেই যে পাত্রী বনে বসে আছো।

আমি কি জানতাম আহসান এমন কুৎসিত লোক?

আমি কিন্তু আগেই আহসানের আসল রূপ চিনে নিয়েছি।

এই তো সবে কাল তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তা তুমি কি করে অনেক আগেই তার আসল রূপ চিনে নিতে পারলে?

সমুদ্রতীরে তোমরা রোজ বেড়াতে যেতে, খেয়াল আছে?

আছে।

নৌকায় চেপে সমুদ্রের পানিতে ঘুরে বেড়াতে, মনে রেখেছো?

রেখেছি।

স্মরণ আছে নৌকার মাঝির কথা?

মনিরা এবার হেসে উঠলো— দুষ্ট কোথাকার!

হুঁ, সেই দিনই আমি ওকে চিনে নিয়েছিলাম। মনিরা, এরা তো শুধু মানুষনামী জীব।

আমি মাহমুদার জন্য একটা জীবকে পছন্দ করেছিলাম, সত্যি আমি এজন্য লজ্জিত ও দুঃখিত।

তুমি দুঃখ করো না মনিরা, এবার আমি নিজে মাহমুদার জন্য পাত্র সংগ্রহ করবো।

সেদিনের পর থেকে বনহুর নিজে একটা ভাল পাত্রের সন্ধানে রইলো। শিক্ষিত, ভদ্র, আর সুন্দর হতে হবে, কারণ মাহমুদার সঙ্গে যেন মানায়।

বনহুর যখন মাহমুদার জন্য একটি পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত তখন একদিন মরিয়ম বেগমের বোনের ছেলে আমিনুর খান কান্দাই শহরের পুলিশ সুপার হয়ে এলো।

অফিসের চার্জ বুঝে নিয়েই আমিনুর খান এলো বড় খালার সঙ্গে দেখা করতে।

আমিনুর খান যুবক, অল্প কিছুদিন হলো সে পুলিশ সুপার হয়ে কান্দাই-এর লাহারায় এসেছে।

মরিয়ম বেগম অনেকদিন পর তাঁর ছোট বোনের ছেলে আমিনুর খানকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। সেই ছোটবেলায় তিনি দেখেছিলেন ওকে। বড় আদরের আমিনুর। আজ কত বড় হয়েছে, মস্তবড় অফিসার হয়েছে সে।

আমিনুর খানও অত্যন্ত আনন্দবোধ করতে লাগলো, কারণ মরিয়ম বেগম তার মায়ের বোন— মায়ের সমান। কদমবুসি করতেই মরিয়ম বেগম ওর মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন, তারপর ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন—মনিরা, মা মনিরা, এসো দেখবে কে এসেছে!

মরিয়ম বেগমের আনন্দভরা কণ্ঠস্বর শুনে মনিরা এবং মাহমুদা একসঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো। নূরও কোথায় ছিলো ছুটে এলো দাদীমার ডাকে।

মনিরা আর মাহমুদা এসে দাঁড়াতেই লজ্জায় কুঁকড়ে গেলো তারা, কারণ মরিয়ম বেগমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি সুপুরুষ যুবক। দামী সুট পরা, চোখেমুখে আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান।

মনিরা আর মাহমুদা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াতেই মরিয়ম বেগম বললেন—মনিরা, একে চিনকে পারছো না? আমার ছোট বোন মাসুমার ছেলে আমিনুর। আর তুমিও হয়তো একে চিনতে পারছো না বাবা! তোমার বড় খালার বোনের মেয়ে মনিরা। আর এ মনিরার বান্ধবী মাহমুদা।

মাহমুদা সালাম জানালো।

আমিনুর খান ওর সালাম গ্রহণ করতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে গেলো মাহমুদার মুখে। ওর কাছে বড় ভাল লাগলো ওকে।

মাহমুদা দৃষ্টি নত করে নিলো।

মরিয়ম বেগম বললেন— এসো দাদু, তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেই।

মরিয়ম বেগম নূরকে কাছে টেনে নিতেই নূর বললো— দাদীমা, উনি কে?

বললেন মরিয়ম বেগম— তোমার চাচা। তারপর আমিনুরকে লক্ষ্য করে বললেন— মনিরার ছেলে নূর। আমার দাদু।

আমিনুর নূরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলো।

❑

আমিনুর খান রীতিমত চৌধুরী বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করলো।

প্রতিদিন একটিবার না এলেই যেন নয়।

মরিয়ম বেগম নিজ পুত্রের স্নেহে আমিনুরকে আদর-যত্ন করতে লাগলেন। মনিরাও ছোট দেওর হিসেবেই গ্রহণ করলো তাকে। কয়েক দিনেই মনিরা বুঝতে পারলো, আমিনুর আর মাহমুদার মধ্যে একটা গভীর ভাব জমে উঠেছে।

মনে মনে খুশি হলো মনিরা, এমন একটা ছেলে মাহমুদার জন্য পেলে তাদের আনন্দের সীমা থাকবে না। একদিন মরিয়ম বেগমকে বলেই বসলো মনিরা— মামীমা, আমিনুর ভাইয়ের সঙ্গে মাহমুদাকে কিন্তু বেশ মানায়! তাছাড়া ওদের মধ্যে একটা ভাবও জমে গেছে গভীরভাবে।

মরিয়ম বেগম হেসে বললেন— আমি ক'দিন থেকে কথাটা বলবো বলবো ভাবছি। আমিনুরের সঙ্গে মাহমুদাকে অপূর্ব মানায়। আমার মনে হয় বিয়েটা মন্দ হবে না।

তবে তুমি প্রস্তাবটা একদিন পেড়েই বসোনা কেন! বললো মনিরা।

মরিয়ম বেগম বললেন— মনির এলে সব বলে দেখো।

আমাদের সবার যদি পছন্দ হয় তাহলে তার অপছন্দ হবে না। তাছাড়া ওদের যখন দু'জনের দু'জনকে পছন্দ।

কয়েকদিন পর একরাতে এলো বনহুর।

মনিরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললো— কই, মাহমুদার জন্য পাত্র পেলে?

বনহুর হতাশ কণ্ঠে বললো— মনিরা, হার মানলাম। সব পাওয়া যায় কিন্তু পাত্র পেলাম না কোথাও।

আমি কিন্তু জিতেছি।

সত্যি।

হাঁ।

কোথায়, কে সে ছেলে?

তোমারই ছোট খালার ছেলে আমিনুর খান।

কই, আমি তো তাকে চিনতে পারছি না?

বেশ, আজ থেকে যাও, কাল তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

তোমাদের যখন পছন্দ হয়েছে তখন আমার সঙ্গে পরিচয় নাইবা হলো। যদি সব ঠিক হয় তাহলে বিয়েতে নিশ্চয় আসবো।

মামীমার সঙ্গে দেখা করবে না?

না লক্ষ্মীটি, আমার অনেক কাজ আছে।

মনিরা আরও বললো— মাহমুদার সঙ্গে আমিনুরের যা ভাব জমে গেছে, তা বলবার ভাষা আমার নেই।

ওরা সুখী হোক, এই আমি চাই। বললো বনহুর।

মনিরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো।

বনহুর মনিরার মুখোভাব লক্ষ্য করে বললো— কি হলো তোমার?

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমিনুর তোমার ছোট খালার ছেলে বটে, কিন্তু তার আর একটা পরিচয় এখনও তোমার জানানো হয়নি।

বলো?

আমিনুর খান লাহারার পুলিশ সুপার......কথাটা বলে স্বামীর মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মনিরা। কিন্তু আশ্চর্য, বনহুরের মুখে কোনোই পরিবর্তন দেখতে পেলো না সে।

বনহুর হেসে বললো— বেশতো, পুলিশ সুপার হবে মাহমুদার স্বামী, এটা তো আনন্দের কথা। কিন্তু একটা কথা, মাহমুদার সবকথা জানতে পেরে যদি পিছু হটে যায়?

সে ভয় নেই, কারণ আমি তাকে একদিন সব কথা খুলে বলেছি। সব শুনে সে দুঃখ করেছে। আমি লক্ষ্য করেছি, সেদিনের পর থেকে মাহমুদার প্রতি তার অনুরাগ যেন আরও বেড়ে গেছে দ্বিগুণ।

তাহলে তো কোনো কথাই নেই।

বিয়ের সব কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা চললো বনহুর আর মনিরার মধ্যে।

রাত ভোর হবার পূর্বেই চৌধুরী বাড়ি থেকে বিদায় নিলো বনহুর সকলের অলক্ষ্যে।

যাবার সময় একটি মূল্যবান হীরকহার সে মাহমুদার জন্য দিয়ে গেলো, বললো— মনিরা, এ হারছড়া রেখে দাও, হঠাৎ যদি কোনো কারণে মাহমুদার বিয়েতে আসতে না পারি, এটা ওর গলায় আমার আশীর্বাদস্বরূপ পরিয়ে দিও।

মনিরা হারছড়া হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কখন যে ভোর হয়ে গেছে খেয়াল নেই, পিছনে এসে দাঁড়ায় মাহমুদা— আপা।

কে, মাহমুদা? তাড়াতাড়ি হাতের হারছড়া কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে ফেলে মনিরা।

কিন্তু দৃষ্টি পড়ে যায় মাহমুদার, বলে সে—ওটা কি আপা?

না, কিছু না। পরে দেখাবো তোমাকে।

কেন আপা আমার কাছে তোমার এত সঙ্কোচ? তোমার হাতের হারছড়া আমি দেখে ফেলেছি কিন্তু।

দেখে ফেলেছো তাহলে?

হাঁ, ভারী সুন্দর, তোমার গলায় অপূর্ব মানাবে।

না, ওটা আমার জন্য নয়, তোমার জন্য।

সেকি। ওটা আমার জন্য কবে তৈরি করলে?

হঠাৎ মনিরা বলে ফেলে— সে দিয়ে গেছে তোমার বিয়েতে ওটা আশীর্বাদস্বরূপ ... হাড়ছড়া বের করে মনিরা।

কে, ভাইয়া?
হুঁ।
কখন এসেছিলেন তিনি?
জানি না।
সেকি আপা, ভাইয়া কখন এসেছিলেন তুমি জানো না বলছো!
ও কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো না মাহমুদা।
মাহমুদার মনে একটা সন্দেহের দোলা নাড়া দিয়ে গেলো—মনিরা তার কাছে কোনো কথা গোপন করার চেষ্টা করছে সে বুঝতে পারলো। নীরব রইলো মাহমুদা, সে হারছড়া নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো।

❑

একটা শুভদিন দেখে বিয়ের আয়োজন হলো।
চৌধুরী বাড়িতে মহা ধুম পড়ে গেলো।
মরিয়ম বেগম আনন্দে আত্নহারা, তাঁর বোনের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে মাহমুদার। মাহমুদাকে এ ক'দিনে তিনি তিনি অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছিলেন। মেয়েটির ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলেছিলো, এমন ধরনের মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না।
বিয়ের দিন সকাল থেকে সেকি জোরসোর আয়োজন। লোকজনে ভরে উঠলো চৌধুরী বাড়ি। আলোয় আলোময়! চারিদিক। বাগানবাড়ির মধ্যে গাছে গাছে আলোর বাল্ব জ্বলছে— যেন তারার মেলা।
মনিরার অনেক বান্ধবী এসেছে, ইশরাৎ জাহানও বাদ যায়নি। যদিও আহসানের সঙ্গে মাহমুদার বিয়ে হলো না তবু সে রাগ বা অভিমান করেনি।
মেয়েরা সবাই মিলে সাজাচ্ছে মাহমুদাকে।
বড় হলঘরটায় পাত্র এবং তার বন্ধু-বান্ধব বসেছে।
বিয়ে সমাধা হলো একসময়।
মাহমুদার মন আজ বড় ভাল নেই, কারণ তার ভাইয়া মনির আসেনি এখন পর্যন্ত। মনিরাকে সে কয়েকবার প্রশ্ন করেছে— আপা, ভাইয়া তো এখন পর্যন্ত এলেন না?
হয়তো সে কোনো কাজে আটকা পড়ে গেছে। জবাব দিয়েছে মনিরা। কিন্তু তার মনটাও সদা-সর্বদা আনমনা রয়েছে—কই, সে তো এলো না!
নববধু বিদায়কালে মরিয়ম বেগমের দূর সম্পর্কীয় বৃদ্ধ চাচা হামিদুল চৌধুরী এগিয়ে এলেন বর-বধূকে আশীবাদ করতে।

আমিনুর খানের হাতে মাহমুদার হাত সঁপে দিতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত হলো তাঁর চোখ দুটো, বললেন তিনি— বোন্, সুখী হয় ... ...

হঠাৎ যেন চমকে উঠলো মাহমুদা, এ কণ্ঠস্বর সে যেন কোথাও শুনেছিলো, কিন্তু কোথায় কবে কখন শুনেছে সে স্মরণ করতে পারে না।

বর-বধু বিদায় হবার পর এক-এক করে আত্মীয়-স্বজন সবাই বিদায় গ্রহণ করেন।

একসময় চৌধুরী বাড়ি নীরব হয়ে আসে।

আজ মনিরাকে বড় ক্লান্ত-অবসন্ন মনে হচ্ছিলো, যদিও সে খেয়ালের বশে সারাটা দিন হই-হুল্লোড় করেছে কিন্তু এখন সে একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে। সব সময় মনে পড়ছে স্বামীর কথা— কেন আজ এলো না সে?

মরিয়ম বেগম এখনও মহা ব্যস্ত রয়েছেন, বাড়ির চাকর-বাকর এখনও খায়নি— কে কি করছে, কোথায় কি করা বাকি রয়েছে, এসব দেখাশোনা করছেন।

মনিরা নিজের কক্ষে এসে বসলো।

রাত বেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নূর দাদীমার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সরকার সাহেব বাইরের কাজ শেষ করে নিচ্ছিলো।

অন্য চাকর-বাকরের সঙ্গে ফুলমিয়াও ব্যস্ত রয়েছে।

নির্জন কক্ষে মনিরা নীরবে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ভাবছে সে, আজ যার বাড়িতে এত ধুমধাম চলেছে, সেই আজ কোথায় কে জানে, কারণ তার উপায় নেই এই উৎসবে স্বাভাবিকভাবে যোগ দিবার।

মনিরা চমকে উঠে— কেউ তার চোখ দুটো পিছন থেকে ধরে ফেলেছে। নিশ্চয়ই তার কোনো বান্ধবী— কিন্তু তারা তো সবাই চলে গেছে। মাহমুদাও আজ নেই, তবে কে এত রাতে তার চোখ দুটোকে এমন করে বন্দী করলো? মনিরা হাতের উপর হাত রাখলো। হাতে বেশ কয়েকটা পাথরের আংটি উপলব্ধি করে বুঝতে পারলো এটা কোনো পুরুষের হাত। মনিরা হাত দু'খানাকে সরিয়ে দিলো এক ঝটকায়। ফিরে তাকাতেই সে বিস্ময়ে থ' হলো, দেখলো মরিয়ম বেগমের বৃদ্ধ চাচা দাঁড়িয়ে আছেন তার পিছনে, মৃদু মৃদু হাসছেন তিনি।

মনিরা ক্রুদ্ধ হলো, বুড়োর কি ভীমরতি ধরেছে। কোনো কথা না বলে মনিরা চুপ রইলো।

বৃদ্ধ বসলো মনিরার পাশে— বাপু, আমায় তুমি ঘৃণা করছো?

মনিরা রাগত গম্ভীর কণ্ঠে বললো— দাদু, আপনি এসব কি শুরু করলেন বলুন তো?

কেন, বুড়ো বলে আমাকে তোর পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?

খুব পছন্দ হয়েছে, এবার ঠাট্টা রেখে যাওতো।

যদি না যাই ... ...

তোমার ভাইঝিকে ডাকবো। ও মামীমা, মামীমা... ...

বৃদ্ধ মনিরার মুখে হাতচাপা দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠে— সর্বনাশ করেছো, ঐ মা এলেন বলে ... ...

তুমি।

হাঁ মনিরা

মনিরা বনহুরের বুকে মাথা রাখে।

বনহুর মনিরাকে গভীর আবেগে বুকে চেপে ধরে বলে —বোনের বিয়েতে না এসে পারলাম না মনিরা। সত্যি, মাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না।

নাও, এবার বুড়োর ড্রেস খুলে ফেলোতো?

কেন, ভাল লাগছে না বুঝি?

উঁ হুঁ। মনিরা নিজ হাতে বনহুরের ড্রেস খুলে ফেললো।

নীচ থেকে বেরিয়ে পড়লো বনহুরের নিজস্ব ড্রেস।

❑

আহসান যখন জানতে পারলো মাহমুদার বিয়ে লাহারার পুলিশ সুপারের সঙ্গে হয়েছে তখন বুদ্ধি আঁটতে লাগলো কেমন করে মনিরাকে সে জব্দ করবে, কেমন করে সে ক্ষতি সাধন করবে চৌধুরী বাড়ির। আহসান যখন এইসব নিয়ে ভীষণভাবে মাথা ঘামাচ্ছে তখন সে কেমন করে যেন জানতে পারলো মনিরার স্বামীই দস্যু বনহুর। চোখ দুটো তার আনন্দে জ্বলে উঠলো— প্রতিশোধ নেবার সুযোগ তার এসেছে!

আহসান কান্দাই পুলিশ সুপার মিঃ আরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে পারলো তার সন্দেহ সত্য। দস্যু বনহুর চৌধুরী বাড়িরই ছেলে এবং মিসেস মনিরা তার স্ত্রী। আরো জানতে পারলো আহসান,দস্যু বনহুরকে যে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে সে এক লাখ টাকা পুরস্কার পাবে।

আহসানের সে কি খুশি! যেমন করে হোক দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে লক্ষ্য টাকা গ্রহণ করবেই। এমন একটা সুযোগ সে মোটেই হারাতে রাজি নয়। একদিন সোজা সে হাজির হলো লাহারার পুলিশ অফিসে।

মিঃ আমিনুর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো।

মিঃ আমিনুর খান তরুণ পুলিশ সুপার, কর্ম দক্ষতায় সে নিজকে আরও উন্নত করতে চায়। সর্বক্ষণ সে ব্যস্ত থাকে কাজ নিয়ে। আহসান নিজের

পরিচয় দিয়ে জানালো —স্যার, আপনার সঙ্গে অত্যন্ত গোপনীয় একটা কথা আছে।

আমিনুর খান হেসে বললো— বলুন?

আহসান আসন গ্রহণ করেছিলো পূর্বেই, এবার সে বলতে শুরু করলো— স্যার, আপনি কান্দাই নতুন এলেও নিশ্চয়ই জানেন, কান্দাই-এর অবস্থা এখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠাময়।

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন খুলে বলুন?

আমি যা বলছি অতি সত্য কথা। দস্যু বনহুর যে ভাবে তার হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে তা আপনি জানেন?

জানি এবং আমি ও দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারে পুলিশ মহলকে যথাসাধ্য সাহায্য করার আশাতেই কান্দাই এসেছি।

খুশি হলাম আপনার কথা শুনে মিঃ খান। দেখুন, আমি কোনো ভূমিকা না করেই বলতে চাই, অবশ্য আপনি যদি আমাকে ভরসা দেন।

নিশ্চয়ই, বলুন?

চৌধুরী বাড়ির মেয়েকে আপনি বিয়ে করেছেন?

হাঁ। কিন্তু আপনি বললেন কোনো ভূমিকা না করেই বলবেন?

তাই বলছি। কিন্তু বাধ্য হয়ে কয়েকটা কথা আমাকে পূর্বে বলে নিতে হচ্ছে। মিসেস মনিরা আপনার কিছু হন নিশ্চয়ই?

হাঁ, আমার ভাবী হন।

ভাবী। কিন্তু আপনার ভাই মানে মিসেস মনিরার স্বামী কে এবং কি তার পরিচয়, জানেন না বুঝি?

এত কিছু দরকার পড়েনি।

একটা কথা, আপনি আমার সঠিক জবাব দেবেন তো?

নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু আপনি বললেন কোনো ভূমিকা না করেই আপনার কথা ব্যক্ত করবেন অথচ......

যতটুকু বলেছি এর একটুকুও আমি ভূমিকা করিনি মিঃ খান। আমি এসেছি আপনার কাজে সহায়তা করতে। কর্তব্যের কাছে আপন-পর কিছু না, তাই নয় কি?

হাঁ, কর্তব্যই আমার কাছে সবচেয়ে বড়।

সত্যি বলছেন তো? খুশিতে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো আহসানের। সে বললো আবার— শুধু কর্তব্য নয়, এর পিছনে আছে এক লাখ টাকা। তাছাড়াও আছে প্রচুর কৃতিত্ব।

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ঠিক বুঝতে পারছি না? ভ্রু কুঁচকে বললো আমিনুর খান।

আহসান বাঁকা চোখে তাকালো এদিক-সেদিক, তারপর বললো—আপনার পরম আত্মীয় মিসেস মনিরার স্বামী আপনার খালাতো ভাই স্বয়ং দস্যু বনহুর!

দস্যু বনহুর!

হাঁ।

কে বললো আপনাকে এ কথা?

আপনি একটু ভাল করে খোঁজ নিলেই সব জানতে পারবেন। অবশ্য আপনার পরম আত্মীয়ই যে মহান দস্যু বনহুর, একথা আপনার পূর্ব হতেই জানা উচিত ছিলো।

বিদেশে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তারপর চাকরি পেয়ে দেশে আসি—এসব সংবাদ জানার সময় আমার হয়নি। আপনি যা বললেন যদি সত্য হয় তাহলে আপনাকে আমি পুরস্কৃত করবো আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে মনে রাখবেন, এর জন্য শাস্তি পেতে হবে আপনাকে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই......আপনি এক্ষুণি কান্দাই পুলিশ অফিসে যোগাযোগ করে জেনে নিতে পারেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার স্ত্রীকে যেন এ কথা জানাবেন না।

আমিনুর খান গম্ভীর হয়ে পড়লো।

সেদিন আহসান আর বেশি কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লো।

আমিনুর খান ফিরে এলো বাসায়।

প্রতিদিন হাসি-খুশি মুখ নিয়ে ফেরে আমিনুর খান। আজ সম্পূর্ণ বিপরীত, গম্ভীর মুখে বাসায় ফিরলো সে।

মাহমুদা হাসিভরা মুখে উচ্ছলভাবে ছুটে আসে—কিন্তু একি, স্বামীকে আজ বড্ড গম্ভীর মনে হয়! মাহমুদা কেমন যেন দমে যায়, বলে—হঠাৎ কি হয়েছে তোমার?

না, কিছু না! নিজকে স্বচ্ছ করার চেষ্টা করে আমিনুর খান। কারণ মাহমুদার দোষ নেই কিছু, সে জানে না মনিরার স্বামী কি........হঠাৎ একটা বুদ্ধি আসে আমিনুরের মাথায়, মাহমুদার দ্বারাই তাকে জয়ী হতে হবে। যা কেউ পারেনি তাই সমাধা করতে হবে— দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে এক লক্ষ টাকার মালিক হতে হবে আর নিতে হবে চরম কৃতিত্ব। ধীরে ধীরে নিজকে স্বচ্ছ করে নিলো আমিনুর খান মাহমুদার কাছে।

মাহমুদা স্বামীকে আজ গম্ভীর দেখে মনে মনে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলো, সে নতমুখে বসে ছিলো একপাশে।

আমিনুর খান জামা-কাপড় ছেড়ে স্ত্রীর পাশে এসে বসলো, চিবুকটা উঁচু করে ধরে বললো— রাগ করেছো মাহমুদা?

এতক্ষণে স্বামীর আদরভরা কণ্ঠে মাহমুদার মন হালকা হলো, সে বললো— না, তোমার উপর রাগ করতে পারি না। হঠাৎ আজ তোমাকে বড্ড গম্ভীর লাগছিলো, তাই ... .

ও কিছু না মাহমুদা, কারণ অফিসের ব্যাপারে আমাদের মনের অবস্থা সব সময় ঠিক থাকে না। চলো, খাবার দেবে চলো।

মাহমুদা উঠে পড়ে।

খাবার টেবিলে বসে বলে আমিনুর খান— মাহমুদা, বিয়ের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলো কিন্তু আজও মনির ভাইয়ার সঙ্গে আমার দেখা হলো না।

মাহমুদারও কি কম দুঃখ। সে বললো— জানি না ভাইয়া হঠাৎ কোথায় উধাও হয়েছেন। বিয়ের সময় তিনি থাকতে পারেননি বলে মনিরা আপার কাছে আমার জন্য এ হারছড়া রেখে গিয়েছিলেন আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ। মাহমুদা গলার হারছড়া উঁচু করে ধরলো।

আমিনুর খান জানতো ও হার মরিয়ম বেগম দিয়েছেন, যখন সে জানতে পারলো হারছড়া দিয়েছে মনিরার স্বামী তখন সে তীক্ষ্ণ নজরে ভাল করে দেখতে লাগলো।

মাহমুদা বললো— আজ নতুন করে হারছড়া দেখছো কেন? বিয়ের পর থেকে ওটা তো আমার গলাতেই রয়েছে।

আমিনুর খান বললো— এতদিন তেমন করে দেখবার সুযোগ হয়নি, আজ তাই নতুন করে দেখছি। হাঁ, হারছড়া অত্যন্ত মূল্যবান বটে। এত মূল্যবান হার যিনি দিলেন তিনি আজও এলেন না আমাদের গরিবালয়ে, সত্যি বড় আফসোস!

তুমি দুঃখ করো না, আমি সব বলবো মনিরা আপাকে। নিশ্চয়ই এতদিন চৌধুরী বাড়ি এসে থাকবেন তিনি।

আচ্ছা মাহমুদা?

বলো?

মনিরার স্বামীর সঙ্গে তোমার কতদিন পরিচয়?

সব তো তোমাকে বলেছি। উনি যদি আমাকে আশ্রয় না দিতেন তাহলে কবে কোথায় হারিয়ে যেতাম, কেউ আমার সন্ধান পেতো না। পরিচয় জাহাজেই প্রথম হয়েছে তার সঙ্গে।

হাঁ, তুমি সব বলেছো। যাক, এবার চৌধুরী বাড়ি গেলে ও বাড়ির সবাইকে দাওয়াত করে আসবে। আমিও যাবো, কারণ মনির ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও আনতে হবে আমাদের বাসায়। বড় সখ আমরা একসঙ্গে মিলিত হই একবার।

বেশ, তোমার যখন এত সখ, তাই হবে।

সমস্ত রাত আমিনুর খানের চোখে ঘুম এলো না, নিজ বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে চললো সে। একবার ভাবে, যত বড় অপরাধীই হোক, মনির তার পরম আত্মীয়, তার সম্বন্ধে কিছু না ভাবাই সমীচীন। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হয়— কর্তব্যের কাছে নিজের পিতা-পুত্রকেও ক্ষমা করা যায় না। তা ছাড়া তার সম্মুখে এটা একটা বিরাট পরীক্ষা, শুধু লক্ষ টাকাই আসবে না, তার সঙ্গে আসবে এক মহা কৃতিত্ব। দেশময় তার নামের সাড়া পড়ে যাবে, জয় জয়কারে মুখর হয়ে উঠবে চারদিক। যেমন করে হোক তাকে কৃতিত্ব লাভ করতেই হবে। এমন সুযোগ হাতে পেয়ে সে হারাতে পারবে না কিছুতেই।

নানারকম চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে আমিনুর খান।

পরদিন অফিসে যাবার সময় আমিনুর খান মাহমুদাকে লক্ষ্য করে বললো— তুমি তৈরি থেকো, বিকেলে এসেই চৌধুরী বাড়ি বেড়াতে যাবো।

স্বামীর কথামত মাহমুদা বিকেলে তৈরি হচ্ছিলো, এমন সময় বয় এসে জানালো— এক ভদ্রলোক এসেছেন, আপনার আত্মীয় হন।

মাহমুদা বললো— তাঁকে হলঘরে বসতে দাও, আমি আসছি।

বয় চলে গেলো।

মাহমুদা একটু পরে হলঘরে এসে আনন্দে অস্ফূট ধ্বনি করে উঠলো— ভাইয়া আপনি!

স্বয়ং দস্যু বনহুর এসেছে মাহমুদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। হেসে বললো বনহুর— হাঁ, এলাম তোমাকে দেখতে। কেমন আছো মাহমুদা?

ভাল আছি। কিন্তু একটা কথা, আজও আপনার সঙ্গে ওর দেখা হলো না, এজন্য তিনি দুঃখিত। আজ চৌধুরী বাড়ি যাবার কথা আছে, তা আপনি এসেছেন ভালই হলো।

আমি তো বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারবো না মাহমুদা। তোমরা দু'জন চৌধুরী বাড়ি যেও। যদি পারি এখন অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

বনহুর মাহমুদার কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসতেই একটা তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো বনহুরের আসনের পাশে।

বনহুর বিস্মিত হলো, যেদিক থেকে তীরফলকটা এসেছিলো সেদিকে তাকালো কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। তীরফলকটা হাতে তুলে নিয়ে দেখলো তাতে গাঁথা রয়েছে এক টুকরা ভাঁজ করা কাগজ। বনহুর কাগজখানা খুলে নিয়ে পড়লো। মাত্র দু'লাইন লেখা—

মিঃ খানের কাছে তোমার পরিচয় প্রকাশ
হয়ে পড়েছে। সাবধান!

—"আশা"

বনহুর অস্ফুট শব্দ করে বললো— আশা, কে তুমি? একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের ফাঁকে। গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো বনহুর।

বনহুরের গাড়ি সোজা এসে থামতো লাহারার পুলিশ অফিসে।

একজন পুলিশ এগিয়ে এলো।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে একটা কার্ড দিলো তার হাতে।

কার্ড নিয়ে চলে গেলো পুলিশটি।

একটু পরে ফিরে এলো সে— চলুন স্যার।

বনহুর অফিসরুমে প্রবেশ করতেই আমিনুর খান উঠে তাকে অভ্যর্থনা জানালো— হ্যালো মিঃ আলী?

বেশ কিছুদিন হলো এসেছেন অথচ সময় করে উঠতে পারিনি দেখা করার, তাই এলাম পরিচয় করতে।

বেশ করেছেন, এজন্য আমি গৌরব বোধ করছি। আমারই উচিত ছিলো আপনার সঙ্গে দেখা করা। বললো আমিনুর খান। আরও বললো সে— লাহারায় এসে অবধি আপনার সুনাম শুনে আসছি, আজ পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি মিঃ আলী।

মিঃ আলী লাহারার একজন গণ্যমান্য ধনবান ব্যক্তি। বনহুর গত রাতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে একখানা কার্ড তুলে পকেটে রেখেছিলো, সেই কার্ডখানাই বনহুর ব্যবহার করলো এই মুহূর্তে। বনহুর কথায় কথায় জেনে নিয়েছিলো মিঃ আলীর সঙ্গে এখনও লাহারার পুলিশ সুপার মিঃ আমিনুর খানের সাক্ষাত লাভ ঘটেনি।

বনহুর বেশ কিছুক্ষণ ধরে একথা সে কথা নিয়ে আলাপ করলো আমিনুর খানের সঙ্গে। তারপর একসময় বললো—আপনার কিন্তু দাওয়াত

রইলো আমার ওখানে, অবশ্যই যাবেন কিন্তু সন্ধ্যার পর। আপনার প্রতীক্ষায় থাকবো।

লাহারার স্বানামধন্য মিঃ আলী জায়েদীর মত লোক নিজে এসে দাওয়াত করে গেলেন— কম কথা নয়। গর্বে স্ফীত হয়ে উঠে আমিনুর খানের বুক। অফিসের কাজ শেষ করে তাড়াহুড়ো করে বাসায় ফিরলো সে।

মাহমুদা স্বামীর প্রতীক্ষায় ছিলো, বললো— এসেছো?

হাঁ, তোমার হয়েছে?

হয়েছে কিন্তু জানো একটু আগে ভাইয়া এসেছিলো.........

ভাইয়া! যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলো আমিনুর খান।

হাঁ, মনিরা আপার স্বামী। বললো মাহমুদা।

দ্রুত সরে এলো আমিনুর খান স্ত্রীর পাশে, দু'হাতে স্ত্রীকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো— কোথায়, কোথায় তিনি মাহমুদা?

একটু আগে চলে গেলেন, অবশ্য তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছিলেন। তাছাড়া ভাইয়া বললেন, তোমার অফিসে গিয়ে দেখা করে তবেই যাবেন তিনি।

কই, আমার অফিসে তো তিনি যাননি! আমার দুর্ভাগ্য যে, তাঁর আগমন হয়েছিলো অথচ দেখা হলো না।

হেসে বলে মাহমুদা— এত হতাশ হচ্ছো কেন, নিশ্চয় দেখা হবে তাঁর সঙ্গে। চলোনা, চৌধুরী বাড়ি যাবে যে বলেছিলে আজ বিকালে?

আমিনুর খান বললো—আজ সেখানে যাওয়া হলো না, কারণ আমার অন্য এক যায়গায় দাওয়াত আছে।

কোথায় তোমার দাওয়াত?

লাহারার স্বানামধন্য ব্যক্তি মিঃ আলী জায়েদী নিজে আমার অফিসে গিয়ে দাওয়াত করে গেছেন। মিঃ আলীকে আজ আমি স্বচক্ষে দেখলাম, সত্যি অদ্ভুত মানুষ তিনি। যেমন অপূর্ব সুন্দর-সুপুরুষ তেমনি মহৎ তাঁর ব্যবহার।

কিন্তু আমার যে বড় সখ ছিলো আজ চৌধুরী বাড়ি যাবো।

আজ হলো না, কাল নিশ্চয়ই হবে।

কাল যদি কোথাও আবার দাওয়াত পেয়ে বসো?

রোজ কি এমন সৌভাগ্য হবে......বলে হাসে আমিনুর খান।

মাহমুদা আমিনুর খানকে সাজিয়ে দিলো নিজের হাতে।

আমিনুর খান সন্ধ্যার পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মিঃ আলী জায়েদীর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

আমিনুর খান আসেনি কোনোদিন এদিকে, তবে ড্রাইভারের কাছে এ বাড়ি অপরিচিত নয়। বাড়ির ফটকে গাড়ি পৌঁছতেই রাইফেলধারী পাহারাদার ফটক খুলে দিলো।

গাড়ি ভিতরে প্রবেশ করে এগিয়ে চললো গাড়ি-বারান্দার দিকে। সেকি বিরাট বাড়ি, বিস্ময় জাগলো আমিনুর খানের মনে। বাড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝা যায় মিঃ আলী জায়েদী ধনবান বটে!

গাড়ি থামতেই আমিনুর খান নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। তাকালো সে চারিদিকে— কই, কেউতো তাকে অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষা করছে না। দারওয়ানরা যে খোনে দাঁড়িয়েছিলো তারা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। আমিনুর খান একটা জিনিস লক্ষ্য করলো, সমস্ত বাড়িখানায় একটা শান্তিময় পরিবেশ যেন বিরাজ করছে।

আমিনুর খান হলঘরের টানা সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে প্রশস্ত বারান্দায় উঠে এলো। পাশাপাশি কয়েকখানা বিরাট বিরাট দরজা। দরজায় ভেলভেটের দামী পুরু পর্দা।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে, এমন নিস্তব্ধ বাড়ি তো সে দেখেনি কোনোদিন। কই, মিঃ আলী তো একেবারে গুম হয়ে গেছেন—ব্যাপার কি! ভেলভেটের ভারী পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আমিনুর খান। সঙ্গে সঙ্গে তার কানে ভেসে আসে গম্ভীর কণ্ঠস্বর— কাকে চান?

আমিনুর খান চোখ তুলে তাকায় সম্মুখে, অবাক হয়ে সে দেখতে পায়—অদূরে একটা আসনে উপবিষ্ট এক অর্ধবয়স্ক ভদ্রলোক, চেহারাটা একনজরে দৃষ্টিতে আটকে যাবার মত। বিরাট বপুর উপরে গোল ফুটবলের মত একটি মাথা। মাথাটা ইলেকট্রিক আলোতে চক্‌চক্‌ করছে যেন, কারণ টাকের জন্য একটিও চুল সেখানে অবশিষ্ট নেই। ফুটবলের মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। পরনে গেঞ্জি-পাজামা, আর কোনো বস্ত্রের বালাই নেই তাঁর দেহে। গেঞ্জির কিছুটা অংশ বুকের কাছে গুটিয়ে আছে, ভুড়িটা ঝুলে পড়েছে তেলের পিঁপের মত। লোকটার গায়ের রংয়ের সঙ্গে আলকাতরার জমকালো রংয়ে তুলনা করা যায়।

আমিনুর খান ভূত দেখার মত আরষ্ট হয়ে গেছে, কোনো জবাব দেবার পূর্বে পুনরায় সেই কণ্ঠ— কে আপনি?

এবার আমিনুর খান গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে —আমি, আমি লাহারার পুলিশ সুপার আমিনুর খান......

পুলিশ সুপারই হন আর পুলিশ কমিশনারই হন, তা আমার এখানে কেন?

আমিনুর খান লোকটার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। লোকটা বলে কি! — তার কাছে পুলিশ সুপার তো দূরের কথা, পুলিশ কমিশনার পর্যন্ত কিছু নয়। অবজ্ঞাভরা কণ্ঠস্বর যেন তাকে তিরস্কার করছে। বললো আমিনুর খান— আমি মিঃ আলী জায়েদীকে চাই। তিনি আমাকে দাওয়াত করে এসেছেন সন্ধ্যার পর যেন আসি......

আমিনুর খানের কথা শেষ হয় না, লোকটা যেন হুঙ্কার ছাড়েন— কি বললেন আপনি?

ঢোক গিলে আমিনুর খান—মিঃ আলী জায়েদী আমাকে দাওয়াত করে এসেছেন।

আপনি কি পাগল না মাতাল?

কই, আমি তো পাগলও নই, মাতালও নই!

তবে কেন এমন আবোল তাবোল বলছেন? আমিই আলী জায়েদী, কবে কখন আপনাকে দাওয়াত করেছি?

এ্যাঁ আপনি......মানে আপনিই আলী জায়েদী?

হাঁ। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি। যত সব জোচ্চোর। সাধে আমি পুলিশের লোককে দেখতে পারি না। যেচে এসেছেন দাওয়াত খেতে। ওটি হবে না আমার দ্বারা। যে ভাতটুকু আপনাকে খাওয়াবো সেটুকু একজন গরিবকে খাওয়াবো, তবু সে বাঁচবে। যান, চলে যান বলছি। হাঁ, যদি অপরাধ পান মানে আমি যদি কোনো মন্দ কাজ করি তখন আসবেন, মাথা পেতে গ্রহণ করবো আপনাদের দেওয়া শাস্তি— কিন্তু সাবধান, বিনা দোষে কাউকে যেন শাস্তি দিতে আসবেন না। যান, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, বেরিয়ে যান।

আমিনুর খান যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছিলো, কান দুটো যেন আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে তার। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা। পা দু'খানা যেন টলছে, রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করতে থাকে, কিন্তু সাহস হলো না সেখানে দাঁড়িয়ে কোনোরকম উচ্চারণ করার। লাহারার পুলিশ সুপার সে— কম কথা নয়, অথচ এ মুহূর্তে একেবারে যেন বোবা বনে যায়।

কি করে পালাবে সে ভেবে অস্থির হয়, কোনোরকমে পিছু হটে বেরিয়ে আসে কক্ষমধ্যে হতে। গাড়ির পাশে এসে বলে—চলো ড্রাইভার।

ডাইভার কোনো কিছু ভেবে পায় না; সে লক্ষ্য করে, মালিককে যেন বেশ উদভ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। বলে ড্রাইভার —স্যার, বাসায় যাবো?

না। রূপম রোডে চলো।

গাড়ি ছুটলো রূপম রোডের দিকে।

ড্রাইভার ভেবে পায় না হঠাৎ সাহেব রূপম রোডে যাবেন কেন? সে তো শহরের আর এক প্রান্তে।

গাড়ি চলেছে।

আমিনুর খান সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে। মাথার মধ্যে নানারকম চিন্তার জাল জট পাকাচ্ছে। কে সেই অদ্ভুত যুবক যে তাকে আজ বিকেলে মিঃ আলী জায়েদীর বেশে দাওয়াত করে এসেছিলো? যে নেম-কার্ড খানা তাকে দিয়ে এসেছিলো সে তো আলী জায়েদীরই নেম কার্ড। ছিঃ ছিঃ কি ভয়ানক অপমান, কি লজ্জার কথা! মিঃ আলী জায়েদীই বা কেমন লোক তিনি তাকে এভাবে অপমান করলেন? এর প্রতিশোধ নিতে হবে। লাহারার পুলিশ সুপার সে, ইচ্ছা করলে সে তাকে বিপদেও ফেলতে পারে। দেখে নেবে সে আলী জায়েদীকে— হোন তিনি ধনবান—ঐশ্বর্য্যবান, এ অপমানের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় লজ্জার কথা, মাহমুদার কাছে বড় মুখ করে বলে এসেছে, সে দাওয়াত খেতে যাচ্ছে, বাসায় আজ খাবে না। নিশ্চয়ই মাহমুদা খেয়ে নিয়েছে, চাকর-বাবুর্চিও সব খেয়ে নিয়েছে। এখন বাসায় ফিরে খাবার চেয়ে খাওয়াও কম লজ্জার কথা নয়। মাহমুদা হাসবে, তার চেয়ে না খেয়ে থাকাই শ্রেয়।

রূপম রোডে পৌঁছে ড্রাইভার বললো—কোথায় যাবো স্যার?

আমিনুর খান বললো— বাসায় ফিরে চলো।

ড্রাইভার অবাক হলো, হঠাৎ রূপম রোডেই বা এলেন কেন আবার ফিরেই বা যাবেন কেন, ভেবে পায় না সে। মালিকের হুকুম মতই তাকে কাজ করতে হবে।

রূপম বহুদূর, কাজেই রাত অনেক হয়ে গেলো বাসায় ফিরতে।

মাহমুদা ঘুমায়নি, সে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলো। স্বামী আসতেই বই রেখে এগিয়ে যায়, হেসে বলে— এত দেরী হলো? খুব খেয়েছো বুঝি?

আমিনুর খান মুখোভাব যতই প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করুক না কেন, তাকে কেমন যেন বিষণ্ন, গম্ভীর মনে হয়। মাহমুদার কথায় মুখে হাসি টেনে বলে—খেয়েছি, অনেক খেয়েছি......

আমিনুর খান মুখে বলছে খেয়েছি, অনেক খেয়েছি কিন্তু পেটে তার আগুন জ্বলছে, কারণ সেই বেলা এগারোটায় নাকেমুখে চারটি গুজে অফিসে গিয়েছিলো। জরুরি একটা কেস ছিলো তাই আরামে খাওয়াটাও আজ হয়নি। বিকেলে মাহমুদার দেওয়া নাস্তাও সে খায়নি দাওয়াত আছে বলে। হায়, কি বেকুবই না সে বনে গেছে আজ।

মাহমুদা বলে আবার— কি কি খেলে বলনা একটু?

সে অনেক খেয়েছি, কত বলবো। এক গেলাস পানি দাও তো?

কেন, পানি খাওনি সেখানে?

খেয়েছি, কিন্তু বড্ড গরম পানি।

গরম পানি!

হাঁ, যেন আগুন......

সে আবার কি রকম?

ও তুমি বুঝবে না। কথাটা বলে মাহমুদার হাত থেকে পানির গেলাসটা নিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে চোখেমুখে চাদর টেনে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু গোটা রাত তার চোখে ঘুম আসে না। ক্ষুধায় পেটের নাড়িভুঁড়ি হজম হবার যোগাড় হয়েছে তার। লজ্জায় বলতেও পারে না সে ঘরে খাবার আছে কিনা।

কোনো রকমে রাত ভোর হয়।

সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করে বলে আমিনুর খান মাহমুদা, শীগ্‌গীর নাস্তা দাও, অফিসে একটা জরুরি কাজ আছে।

মাহমুদা স্বামীর জন্য অল্প কিছু হাল্কা ধরনের নাস্তা এনে টেবিলে রাখলো।

আমিনুর খান নাস্তার পরিমাণ দেখে মনে মনে চটে গেলো খুব করে, বললো— ওসব ছাড়া আর কিছু ছিলো না?

এই সামান্য একটু নাস্তা তাও খাবে না তুমি? কাল রাতে এত কি খেয়ে এসেছো বলতো? আচ্ছা আরও একটু কমিয়ে নিচ্ছি। মাহমুদা নাস্তার পরিমাণ আরও কমিয়ে দেয়।

আমিনুর খান অগত্যা বলেই বসে— সরিয়ে নিতে হবে না, রাখো।

মাহমুদা নাস্তা যা উঠিয়ে নিয়েছিলো আবার প্লেটে সাজিয়ে রাখে।

আমিনুর খান গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

মাহমুদা অবাক হয়ে যায়।

স্বামীর খাওয়া শেষ হলে বলে মাহমুদা—ওগো, আজ চৌধুরী বাড়ি যাবে না?

যাবো, তুমি তৈরি থেকো, কেমন?

নিশ্চয়ই থাকবো। আজ আবার কোথাও দাওয়াত নিয়ে বসোনা যেন।

না, আজ আর দাওয়াত পেলেও যাচ্ছি না। জামা পরতে পরতে বললো আমিনুর খান।

❑

রহমান, আজও সেই আশা সাবধানবাণী জানিয়ে আমাকে সাবধান করে দিয়েছে। সত্যিই আশ্চর্য, এই নারী যে আমার চোখে ধুলো দিয়ে আমার পিছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি সে আমার দরবারকক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলো। কথাগুলো বলে থামলো বনহুর।

রহমান বললো—সর্দার, বহু সন্ধান করেও এর কোনো সমাধান আমরা খুঁজে পাইনি। নতুন কোনো লোককে আমরা উপস্থিত আমাদের দলে গ্রহণ করিনি।

কিন্তু একথা সত্য, কেই আমাদের দরবারকক্ষে প্রবেশ করে আমার সেদিনের নির্দেশগুলো শুনে নিয়েছিলো।

সেদিনের আশার উক্তিতে ঐ রকমই বুঝা যায়।

রহমানের কথা শেষ হয় না, কক্ষে প্রবেশ করে একজন অনুচর, বনহুরকে কুর্নিশ জানিয়ে বলে— সর্দার, একটা জরুরি সংবাদ আছে।

বলো?

রহমান উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালো অনুচর হাসিমের মুখের দিকে। হাসিমও বনহুরের কান্দাই শহরের আস্তানার অনুচর, না জানি কি সংবাদ সে বহন করে এনেছে।

বললো হাসিম—সর্দার, মনসুর ডাকু কারাগার থেকে পালিয়েছে।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো রহমান— মনসুর ডাকু কারাগার থেকে পালিয়েছে, বলো কি?

বনহুর একটু হেসে বললো— এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই রহমান। আমি জানতাম, মনসুর ডাকুকে পুলিশ সায়েস্তা করতে পারবে না।

সর্দার, মনসুর ডাকু নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে তার আস্তানায়।

হাঁ, সে ফিরে এসেছে তাতে কোনো ভুল নেই। ভবেছিলাম অন্ততঃ কিছুদিন মনসুর ডাকুর অত্যাচার থেকে দেশবাসী পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু তা হলো না। রহমান, এবার আর ক্ষমা নয়, আমি নিজে তাকে শাস্তি দেবো। হাসিম, তুমি জানো শুধু মনসুর ডাকু পালাতে সক্ষম হয়েছে, আর গোমেশ কি আটকা রয়েছে?

মনসুর ডাকু গোমেশসহ পালাতে সক্ষম হয়েছে সর্দার। পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে গেছে। চারিদিকে সন্ধান চলেছে তন্ন তন্ন করে।

তা তো হবেই।

❑

দস্যু বনহুরের আস্তানায় যখন মনসুর ডাকুকে নিয়ে কথাবার্তা চলছিলো তখন মনসুর ডাকু তার গোপন আড্ডায় জন্তুর মত গর্জে গর্জে উঠছিলো। তার সহচর গোমেশকে লক্ষ্য করে বলে উঠে সে—বনহুর আমাকে এই ভাবে নাকানি-চুবানি খাওয়ালো, এর প্রতিশোধ আমি নেবোই।

গোমেশ বলে উঠলো—আমি শপথ করলাম, দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করে এনে এবার জীবন্ত মাটিতে পুঁতে হত্যা করবো।

ইরানীর চোখে একটা উজ্জ্বল আনন্দভাব খেলে গেলো, খুশিভরা কণ্ঠে বললো— গোমেশ, তুমি যদি দস্যু বনহুরকে জীবন্ত পাকড়াও করে এনে মাটিতে পুঁতে হত্যা করতে পারো তাহলে আমি তোমার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবো।

মনসুর ডাকুর চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলছিলো, এই মুহূর্তে সে দস্যু বনহুরকে পেলে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলবে। বললো মনসুর ডাকু—যে ফাঁদ আমি পেতেছিলাম তাতে ব্যর্থ হয়েছি। এবার আমি যে ফাঁদ পাতবো তাতে বনহুরকে আটকাতেই হবে।

গোমেশ বললো—এবার আমাদের নতুন ভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে।

ইরানী বলে উঠলো—যে বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা তোমরা দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করবে তা অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে করবে। দস্যু বনহুর শুধু শক্তিশালী নয়, অত্যন্ত চতুর। গোমেশ, আমি তোমাকে তার গোপন আস্তানার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

গোমেশ খুশি হয়ে উঠলো—সত্যি পারবে আমাকে দস্যু বনহুরের আস্তানার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে?

পারবো, কারণ আমাকেও দস্যু বনহুর কম নাকানি-চুবানি খাওয়ায়নি। আমাকে সে প্রথমে এক নির্জন বাংলোয় আটকে রেখেছিলো। তারপর আমি আবিষ্কার করি এক গোপন সুড়ঙ্গপথ।

ইরানীর কথা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠে মনসুর ডাকু, বলে সে—মা ইরানী, তুই আমাদের মুখ রাখবি। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করে আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যা কেউ কোনোদিন কল্পনা করতে পারে না।

গোপনে আরও কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হলো।

❑

পরদিন।

ইরানী গোমেশসহ বেরিয়ে পড়লো দস্যু বনহুরের নির্জন বাংলোর উদ্দেশ্যে।

গোমেশ সন্ন্যাসী বেশে সজ্জিত হয়েছে আর ইরানী এক তরুণী যোগিনীর বেশে। কপালে চন্দনের তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চুলগুলো ঝুটি করে মাথার উপরে বাঁধা।

নির্জন বাংলোর পথ ধরে এগুচ্ছে ওরা।

গোমেশ মাঝে মাঝে বলছে— ইরানী, আর কতদূর?

ইরানী হেসে বলে— এরি মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লো গোমেশ?

না না, হাঁপিয়ে পড়বো কেন? তবে বলছি আর কতদূর?

এলেই দেখতে পাবে, চলো।

ইরানী আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—ঐ যে দূরে একটা বন দেখছো ওর ওপারে।

সর্বনাশ, অত দূর হাঁটতে পারবে তুমি?

ইরানী বললো—বারে, এইটুকু পথ হাঁটতে পারবো না। তবে ডাকুর মেয়ে হলাম কেন? চলো, পা চালিয়ে চলো।

এক সময় নির্জন বাংলোর নিকটে পৌঁছে গেলো গোমেশ আর ইরানী। ইরানী বললো— এই সেই নির্জন বাংলো। এর অভ্যন্তরে আছে এক গোপন সুড়ঙ্গপথ। সে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে তুমি যদি ঠিক জায়গায় যেতে পারো তবে তুমি জয়ী হবে। সেখানে তুমি পাবে দস্যু বনহুরকে। কিন্তু মনে রেখো, তাকে জীবিত অবস্থায় মনসুর ডাকুর দরবারে হাজির করতে হবে, তবেই আমি তোমায় মালা দেবো— জয়মাল্য বুঝলে? কারণ, তাকে আমি নিজ হাতে জীবন্ত সমাধিস্থ করবো। আমার বাপুকে সে অপদস্থ করেছে, আমাকে সে নাজেহাল করেছে, তোমাকেও......

ইরানীর কথা শেষ হয় না, পিছনে এসে দাঁড়ায় স্বয়ং দস্যু বনহুর আর রহমান। সম্মুখে একটা সন্ন্যাসী এবং একটি যোগিনী তরুণী দেখে সরে আসে।

বনহুর আর রহমানের শরীরে স্বাভাবিক ড্রেস।

বনহুর বলে—সন্ন্যাসী, কি দেখছো ওদিকে তাকিয়ে?

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বেশে গোমেশ কাঁপা কণ্ঠে বলে—সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাই ওখানে একটু আশ্রয় পাবো কিনা তাই ভাবছি। বাবা, তোমরা বলতে পারো ওখানে কে থাকেন?

আমরা থাকি। বললো বনহুর।

সন্ন্যাসী বললো—আমাদের একটু জায়গা দেবে বাবা ওখানে?

দেবো, এসো আমার সঙ্গে।

ইরানী বনহুরকে দেখেই চিনিতে পেরেছিলো, গোমেশকে লক্ষ্য করে মৃদু কণ্ঠে বলে—চিনতে পেরেছো এরা কে?

গোমেশও কম ঘুঘু নয়, সে ফিস্ফিস্ করে বললো— তুমি চিনবার পূর্বে আমি চিনে ফেলেছি।

চুপ করো, ওরা শুনে ফেলবে—তাহলে বিপদ!

বনহুর আর রহমানের পিছু পিছু এগিয়ে চললো গোমেশ আর ইরানী।

নির্জন বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করে মোমবাতি জ্বালালো বনহুর। বাংলোর মধ্যে তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলো জ্বেলে টেবিলে রাখলো বললো— রহমান, আমার অতিথিদ্বয়ের থাকবার এবং খাবার ব্যবস্থা করো।

আচ্ছা জনাব! বললো রহমান, তারপর বেরিয়ে গেলো। বনহুর গোমেশকে লক্ষ্য করে বললো— সন্ন্যাসী বাবা, এ যোগিনী কে.....

বনহুরের কথা শেষ না হতেই বলে উঠে ইরানী— সন্ন্যাসী আমার পিতা!

বেশ বেশ, পিতা-পুত্রী আজ আমার অতিথি। আজ আমার পরম সৌভাগ্য। সন্ন্যাসী বাবা, তুমি এক কক্ষে শয়ন করো, তোমার কন্যা পাশের কক্ষে শয়ন করুক। কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ এই দেখো শয্যা পাতা রয়েছে।

ইরানী আর গোমেশ নিজেরা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। তারপর ইরানী বাধ্য হলো বনহুরকে অনুসরণ করতে।

পাশের কক্ষে প্রবেশ করে বলে .নহুর—এই কক্ষ তোমার জন্য। ঐ যে শয্যা ওখানে শয়ন করবে। আংগুল দিয়ে পাশের একটি খাটে শয্যা পাতা ছিলো দেখিয়ে দিলো সে। সরে এলো বনহুর আরও কাছে, তারপর বললো— ইরানী, আমার চোখে ধূলো দেবোর জন্য তুমি যোগেনীবেশ ধারণ করেছো?

বনহুরের কথায় চমকে উঠে ইরানী, চোখেমুখে তার ভীতি ভাব ফুটে উঠে। বনহুর তাকে চিনে ফেলেছে— সর্বনাশ, এবার উপায়?

ইরানীর মুখোভাব লক্ষ্য করে বলে বনহুর— তুমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো তা আমি জানি। তোমার সঙ্গীটি কে?

ইরানী ঢোক গিলে বলে— ইরানী কে, আমি তাকে চিনি না। আমার সঙ্গী আমার পিতা হন।

বনহুর হেসে বলে— চেনো না, ইরানী কে জানোনা তুমি?

না, জানি না।

তোমার সঙ্গী তোমার পিতা নয় তোমার বাবার সহচর গোমেশ। তার কণ্ঠস্বর আমাকে পরিচয় বলে দিয়েছে।

ইরানী এবার সত্যি বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে ভাবতে পারেনি তাদের ছদ্মবেশ বনহুরের কাছে ধরা পড়ে যাবে।

বনহুর বলে—দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে এসে নিজেরাই বন্দী হলে। হাতে তালি দিলো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে দু'জন জমকালো পোশাক পরা লোক প্রবেশ করলো, তারা কুর্ণিশ জানালো বনহুরকে। বনহুর লোক দু'টিকে লক্ষ্য করে বললো—পাশের কক্ষে এক সন্ন্যাসী আছে, তাকে বন্দী করে নিয়ে চলো আমার বিচারকক্ষে। লোক দুটি বেরিয়ে যায় পুনরায় বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে।

লোক দু'জন যেতেই বনহুর বললো— ইরানী, এসো আমার সঙ্গে।

ইরানী বাধ্য হলো বনহুরকে অনুসরণ করতে। মনের যত সাহস তার উবে গেছে কর্পূরের মত।

এ পথ সেপথ করে বহুপথ চলে এক সুড়ঙ্গমুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর। সুড়ঙ্গমুখের দরজা লৌহকপাটে বন্ধ ছিলো। বনহুর পাশের দেওয়ালে একটা সুইচে চাপ দিতেই খুলে গেলো লৌহকপাট।

বনহুর ভিতরে প্রবেশ করে বললো—এসো।

ইরানী বন্দিনীর মত অনুসরণ করলো বনহুরকে।

কিছুক্ষণ চলার পর সেই কক্ষে এসে পৌঁছলো বনহুর আর ইরানী, যে কক্ষে একদিন ইরানী বনহুরকে এক ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখেছিলো।

কক্ষমধ্যে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলো ইরানী, দেখলো একটা থামের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা রয়েছে তার পিতা মনসুর ডাকুর প্রধান সহচর গোমেশ। তার দেহে এখনও সন্ন্যাসীর পোশাক পরা রয়েছে, শুধু মুখের দাড়ি এবং জটা জুট খসে পড়েছে।

গোমেশ ইরানীকে দেখামাত্র কটমট করে তাকালো, সে মনে করেছে ইরানীর জন্য তার এ অবস্থা হলো। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো গোমেশের সম্মুখে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বললো—গোমেশ, মনে পড়ে একদিন তোমরা আমাকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিলে? মনে পড়ে আমার শিশুপুত্রকে এক ফোঁটা পানির জন্য তিল তিল করে শুকিয়ে মেরেছিলে?

গোমেশ বলে উঠলো— সে আমি নই, আমাদের মালিকের আদেশ......

হাঁ, মালিকের আদেশেই বটে। তোমাদের মালিককেও এখানে হাজির করা হবে। বললো বনহুর।

ইরানী শিউরে উঠলো।

বনহুর বললো—গোমেশ, জানতে না সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করলে আর বের হওয়া যায় না?

গোমেশ তাকালো ইরানীর দিকে।

ইরানীও তাকিয়েছিলো গোমেশের দিকে, সেও রাগে ফুঁসছিলো ভিতরে ভিতরে।

গোমেশকে যে থামটার সঙ্গে মজবুত শিকল দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন অনুচর আর রহমান।

বনহুর বলে এবার—রহমান?

বলুন সর্দার।

মনসুর ডাকুকে নিয়ে এসো।

চমকে উঠলো ইরানী আবার, ভীত দৃষ্টিতে তাকালো সে বনহুরের মুখের দিকে।

রহমান এবং অনুচরদ্বয় বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বললো— ইরানী, অপেক্ষা করো তোমার পিতাকেও তুমি দেখতে পাবে।

একটু পরে রহমান এবং দুজন অনুচর মনসুর ডাকুকে হাত-পা লৌহশিকলে আবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে এলো সেই কক্ষে। যেমন বন্দী হিংস্র জানোয়ারকে নিয়ে আসা হয়, তেমনি টেনে নিয়ে আসা হলো।

ইরানী আর্তনাদ করে উঠলো—বাপু।

মনসুর ডাকুর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

বনহুর তার অনুচরদের আদেশ দিলো— মনসুরকেও তার সহচরের পাশে লৌহশিকলে আবদ্ধ করো।

বনহুরের অনুচরদ্বয় মনসুর ডাকুকে টেনে-হিঁচড়ে গোমেশের পাশে আর একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ফেললো মজবুত করে।

ইরানী রোদন করে চললো।

গোমেশের চোখেমুখে বিস্ময়, সে না হয় ভুল করে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে আটকা পড়েছে কিন্তু তাদের সর্দারকে কিভাবে বন্দী করলো।

মনসুর ডাকুকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো।

পাশাপাশি মনসুর ডাকু আর গোমেশ-দু'জনকে ঠিক জীবন্ত নরপিশাচের মত দেখাচ্ছে।

বনহুর হেসে উঠলো, তারপর বললো— পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছো, কিন্তু আমার এই ভূগর্ভকারাগার থেকে পালাতে পারবে না আর কোনোদিন। গোমেশ, তুমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছো সর্দারকে বন্দী অবস্থায় দেখে, না? ইরানী, তুমিও অবাক হয়েছো। মিথ্যা পিতা সাজিয়ে গোমেশকে নিয়ে হাজির হয়েছিলে আমার গোপন বাংলোয়। সব ফাঁস হয়ে গেলো, আটাকাও পড়লে। এবার রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর— রহমান, মনসুর আর গোমেশকে এইভাবে এক সপ্তাহ বন্দী করে রাখবে, তারপর বিচার হবে এদের। ইরানী, তুমি যে অপরাধ করেছো তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড কিন্তু তুমি নারী, তাই তোমাকে মৃত্যুদন্ড না দিয়ে আমার ভূগর্ভ পাতালপুরীর কারাকক্ষে বন্দী করে রাখা হবে, অবশ্য যতদিন তোমার পিতা এবং গোমেশের বিচার শেষ না হবে।

বনহুর কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেলো সেখানে থেকে।

রহমান এবার ইঙ্গিত করলো অনুচরদ্বয়কে।

অনুচরদ্বয় ইরানীকে ধরে টেনে নিয়ে চললো।

রহমান একপাশে সরে গেলো, দেওয়ালে হাত দিয়ে একটা বোতামে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে গোমেশ আর মনসুর ডাকুর চারপাশে উঁচু হয়ে উঠে এলো একটা গোলাকার লৌহ প্রাচীর। মনসুর ডাকু আর গোমেশের চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হয়ে গেলো।

খাবার টেবিলে সব গুছিয়ে রাখছিলো মাহমুদা। আজ তার বড় আনন্দ— চৌধুরী বাড়ি থেকে সবাই আসবে তাদের বাসায়। মরিয়ম বেগম, মনিরা, নূর, সরকার সাহেব, এমনকি মনির ভাইয়াও আসবে দাওয়াত খেতে। সেদিন আমিনুর খান আর মাহমুদা নিয়ে গিয়ে দাওয়াত করে এসেছে। যদিও মনির ভাইয়া সেদিন ছিলো না তবু মনিরা কথা দিয়েছে তাকে না নিয়ে আসবে না সে।

আজ সকালে মনিরা ফোন করেছিলো— রাতে তারা আসবে, মনিরও আসবে জানিয়েছে সে। চাকর-বাকর আর বাবুর্চিকে নিয়ে সমস্ত দিন ধরে মাহমুদা খাবারের আয়োজন করেছে। অনেক রকম রান্নাবান্না করেছে— পোলাও কোরমা, কোপ্‌তা, কাটলেট, পায়েস, বরফি, জরদা বহু কিছু। সন্ধ্যার পূর্বে রান্না শেষ করে ফেলেছে মাহমুদা।

বাবুর্চি এবং চাকর-বাকরের সাহায্যে এবার খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে নিচ্ছিলো মাহমুদা, কারণ ওরা এলে সে যেন ওদের সঙ্গে বসে গল্পসল্প করতে পারে, কোনো অসুবিধা যেন না হয়।

মাহমুদা সব গুছিয়ে কোনো কাজে হলঘরের পাশ কেটে তাদের শয়নকক্ষের দিকে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তার কানে এলো তার স্বামীর চাপা কণ্ঠস্বর— ইন্সপেক্টার, আপনি এবং মিঃ ফরিদ হোসেন পাশের কামরায় থাকবেন। মিঃ জরিফ পুলিশ ফোর্স সহ বাসার চারপাশে আত্মগোপন করে থাকবেন।

মাহমুদা আরও সজাগ হয়ে কান পাতলো—তার স্বামী এসব কি বলছে, কাকেই বা বলছে আর কেনই বা বলছে! ভাল করে শুনতে চেষ্টা করলো মাহমুদা। এবার তার কানে এলো আর একটি কণ্ঠ—স্যার, দস্যু বনহুর কি এত সোজা লোক যে, এভাবে স্ত্রী-পুত্র-মাকে নিয়ে দাওয়াত খেতে আসবে।

আপনি জানেন না ইন্সপেক্টার, স্বয়ং দস্যু বনহুর আমার পরম আত্মীয়— যদিও বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে তবু বলছি।

স্যার, দস্যু বনহুর আপনার আত্মীয়—এ লজ্জার কথা নয় বরং আপনার গর্বের কথা। কারণ, দস্যু বনহুরকে দেশবাসী ঘৃণা করে না—শ্রদ্ধা করে।

ইন্সপেক্টার, আপনি সত্য কথাই বলছেন, কিন্তু কর্তব্যের কাছে সব কিছু বিসর্জন দিতে হচ্ছে আমাকে। আমি পূর্বে জানতাম না, আমারই খালার একমাত্র সন্তান মনির চৌধুরীই দস্যু বনহুর---

এরপর মাহমুদা আর দাঁড়াতে পারে না, তার পা দু'খানা যেন মাতালের মত টলছে। কোনোরকমে দেয়াল ধরে চলে এলো শোবার ঘরে। ধপ্ করে বসে পড়লো মেঝেতে তারপর আবার উঠে দাঁড়ালো, কোনো রকমে খাটে বসে আঁকড়ে ধরলো খাটের হাতলটা। সব কথা আজ স্পষ্ট হয়ে মনে পড়তে লাগলো তার। কত দিনের স্মৃতি আজ একটির পর একটি ভেসে উঠতে লাগলো তার মনে। যত দিনের যত কথা মাহমুদার মনে উদয় হলো—সে মনিরা চৌধুরীকে এক দেবমূর্তি সদৃশই দেখতে পেলো, কোথাও সে খুঁজে পেলো না তার মাঝে জঘন্য কোনো মানোবৃত্তির পরিচয়।

কতক্ষণ বসে ছিলো খেয়াল নেই, হঠাৎ আমিনুর খানের ডাকে চমক ভাঙ্গে তার, চমকে উঠে সে।

আমিনুর খান বলে—এখানে অমন করে বসে আছো কেন, চলো। ওরা যে এসে পড়বে!

মাহমুদা উঠে দাঁড়ায়, পা দু'খানা তার কাঁপছে, ভয়ে নয়—দুর্ভাবনায়। তার বাড়িতে আসবে মনিরা তার স্বামীকে নিয়ে দাওয়াত খেতে—কত আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে কিন্তু পরিণাম সে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। তার বাসার চারপাশে আত্মগোপন করে আছে সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স। পাশের কক্ষে উদ্যত রিভলভার হস্তে প্রতীক্ষা করছেন দুজন পুলিশ অফিসার। না না, এ হতে পারে না জেনেশুনে সে কিছুতেই এমন একটা কাণ্ড হতে দেবে না।

আমিনুর খান স্ত্রীকে কেমন যেন বিবর্ণ আর আনমনা দেখে বললো—হঠাৎ কি হলো তোমার? কোনো অসুখ করেনি তো?

না।

তবে অমন চুপচাপ এ ঘরে বসেছিলে কেন?

মাথাটা হঠাৎ বড্ড ধরেছে কিনা---

এইতো একটু আগে বললে কোনো অসুখ করেনি।

তেমন ধরেনি—সামান্য।

চলো, এখন ওরা এসে পড়বে।

মাহমুদা মৃতের ন্যায় ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, কোনো কথা না বলে স্বামীকে অনুসরণ করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ি-বারান্দায় চৌধুরী বাড়ির গাড়ি এসে থামলো।

আমিনুর খান বলে উঠলো—মাহমুদা, ওরা এসেছেন, চলো ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসি।

মাহমুদার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম হলো, আজ সে বুঝতে পারছে আমিনুর খান তার ভাইয়া এবং মনিরাকে দাওয়াত জানিয়ে এ বাড়িতে আনার জন্য কেন এত আগ্রহী ছিলো। তবু স্থবিরের মত আমিনুর খানের সঙ্গে এগিয়ে চললো সে। মনে মনে খোদাকে স্মরণ করছে হে খোদা ভাইয়া যেন না আসেন।

গাড়ি-বারান্দায় পৌঁছে মাহমুদা প্রথমেই লক্ষ্য করলো ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসেছে, মনিরা মরিয়ম বেগম আর নূর পিছন আসনে। ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

এতক্ষণে মাহমুদা যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলো, আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো সে।

কিন্তু আমিনুর খানের মুখ গম্ভীর কালো হয়ে উঠেছে। তবু মুখোভাব যতদূর সম্ভব প্রসন্ন রেখে অভ্যর্থনা জানালো সে মরিয়ম বেগম আর মনিরাকে। ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—মনির ভাইয়া অসেনি কেন?

মরিয়ম বেগমই জবাব দিলেন—ওর কথার কোনো ঠিক নেই বাবা। কথা দিয়ে গিয়েছিলো আসবে কিন্তু কই এলো!

মনিরা বললো—তার জন্য প্রতীক্ষা করতে করতেই এত বিলম্ব হয়ে গেলো।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো সবাই।

আমিনুর খান আর মাহমুদা তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে চললো।

সরকার সাহেবও মরিয়ম বেগম এবং মনিরার সঙ্গে বাসার ভিতরে গেলেন।

ড্রাইভার গাড়িতে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো সে।

মাহমুদা পূর্বের চেয়ে এখন অনেকটা স্বচ্ছ—প্রসন্ন হয়ে এসেছে, একটা বিরাট দুশ্চিন্তার হাত থেকে উপস্থিত সে যেন রেহাই পেয়েছে। কিন্তু মন তার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি হতেও পারে না কারণ সে আজ এমন একটা কথা জানতে পেরেছে যা তার মনে বিপুলভাবে আলোড়ন জাগিয়েছে। মনিরা আপার স্বামী স্বয়ং দস্যু বনহুর এ যেন তার কল্পনার বাইরে। মাহমুদাকে কিছুটা চিন্তাযুক্ত মনে হলেও আমিনুর খানকে পূর্বের চেয়ে বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছিলো। ক'দিন থেকে আমিনুর খান সর্বক্ষণ একটা উত্তেজনাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে কাটাচ্ছিলো, আজ নিমিশে তার সে বিপুল উত্তেজনা যেন দপ্ করে ঠান্ডা হয়ে গেছে। কথাবার্তা বলছে বটে কিন্তু সে কথায় যেন কোনো উদ্দীপনা নেই।

খাবার টেবিলে সবাই যখন খেতে খেতে হাসি-গল্প নিয়ে মেতে উঠছে তখন আমিনুর খান সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে। হলঘরের দরজা দিয়ে পাশের ছোট কামরায় প্রবেশ করে।

ড্রাইভারের দৃষ্টি আমিনুর খানকে লক্ষ্য করে। সে গাড়িতে বসে তাকিয়ে ছিলো বাইরের দিকে, অবশ্য তার খেয়াল ছিলো হলঘরের অভ্যন্তরে।

দু'জন পুলিশ অফিসারসহ বেরিয়ে এলো আমিনুর খান। হলঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো আমিনুর খান এবং পুলিশ অফিসারদ্বয়।

ড্রাইভার শুনতে পেলো আমিনুর খান পুলিশ অফিসারদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলছে—সব চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়ে গেলো ইন্সপেক্টার।

স্যার, আমি পূর্বেই বলেছিলাম দস্যু বনহুরকে এত সহজে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমি শপথ করছি, আজ যা পারলাম না দু'দিন পর পারবোই পারবো। আমার আত্মীয় হলেও আমি তাকে রেহাই দিবো না।

ড্রাইভার লক্ষ্য করলো একটা গাড়ি এসে থামলো অদূরে পুলিশ অফিসারদ্বয় আমিনুর খানের সহিত করমর্দন করে বিদায় গ্রহণ করলো।

পরক্ষণেই একটা পুলিশ ভ্যান এসে থামলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাগান হতে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কতকগুলো রাইফেলধারী পুলিশ, আমিনুর খানকে সেলুট ঠুকে সবাই ভ্যানে চেপে বসলো।

বিমর্ষ মুখে আমিনুর খান তাকিয়ে রইলো সেইদিকে।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলো, আমিনুর খানকে সালাম জানিয়ে বললো—সাহাব, এতনা পুলিশ কাহেকো আয়া থা?

রাগতভাবে বললো আমিনুর খান—ও তুমি বুঝবে না ড্রাইভার।

সালাম সাহাব! বললো ড্রাইভার।

যাও। জবাবে বললো আমিনুর খান।

পুলিশ ভ্যান তখন বেরিয়ে গেছে।

ড্রাইভার ফিরে এলো তার গাড়িতে।

আমিনুর খান বিমর্ষ মুখে অন্দরবাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

❑

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে বললেন—ড্রাইভার তুমি যে বড় বেয়াড়া দেখছি একেবারে দোতলায় এসে পড়লে? সাহস তো কম নয় তোমার!

ড্রাইভার দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেললো একটানে মাথার ক্যাপটা খুলে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ---

অবাক হয়ে যান মরিয়ম বেগম, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বের হচ্ছে না।

মনিরা মৃদু মৃদু হাসছে।

সরকার সাহেব আর নূর নিচেই রয়ে গেছে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—মাগো, তুমিও আমাকে চিনতে পারোনি। জানো মা, তোমার বোনের ছেলের আজকের আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ---হাঃ হাঃ হাঃ---সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

মনির, তুই কি বলছিস্ বাবা?

তুমি জানো না মা, আমিনুর খান কেন তোমাদের দাওয়াত করে খাওয়াতে গেলো। তোমার ছেলেকে সে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন করেছিলো।

বলিস্ কি বাবা?

হাঁ মা। তোমরা যখন ভিতর বাড়িতে খাবার টেবিলে খাচ্ছিলে তখন তোমার বোনের ছেলে বেরিয়ে এসেছিলো বাইরে, তোমরা হয়তো লক্ষ্যই করোনি। জানো সে কেন সকলের অলক্ষ্যে বাইরে এসেছিলো? জানো না। বাইরে হলঘরের মধ্যে দু'জন পুলিশ অফিসার লুকিয়ে ছিলো আর বাসার সম্মুখস্থ বাগানে আত্মগোপন করে ছিলো অগণিত সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স।

এসব কি বলছিস্ মনির?

সব সত্য মা, সব সত্য। তোমার বোনের ছেলে আমাকে তোমাদের সঙ্গে না দেখতে পেয়ে কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে ছিলো, মুখখানা তার অমাবস্যার মত কালো হয়ে গিয়েছিলো; খেয়াল করোনি তোমরা।

এসব জানলে আমি কিছুতেই যেতাম না। কি সর্বনেশে কথা। আমিনুর তোকে---

হাঁ, আমাকে সে গ্রেপ্তার করে পুলিশ মহলে স্বনামধন্য হতে চায়। আর পেতে চায় লক্ষ টাকা পুরস্কার।

আমিনুর আমার নিজের বোনের ছেলে হয়ে--

মা, তুমি এ দুনিয়াকে আজও চিনতে পারোনি। যাক ও সব কথা। চলো মা, আমাকে কিছু খেতে দেবে চলো।

হা, এ কি বলছিস্ বাবা? আমাদের সঙ্গেই ছিলি অথচ তুই না খেয়ে রইলি আর আমরা পেট পুরে খেলাম।

দুঃখ করোনা মা, তোমার হাতের খাবার না খেয়ে যে তৃপ্তিই হবে না।

মরিয়ম বেগম হাস্যোজ্জ্বল মুখে চলে গেলেন।

বনহুর মনিরার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললা কক্ষের দিকে।

❑

এক সপ্তাহ আমি পানি পান করিনি বনহুর। আঃ মরে গেলাম---একফোঁটা পানি দাও এক ফোঁটা পানি দাও ---মনসুর ডাকু জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা চাটতে লাগলো।

হাঃ হাঃ হাঃ---পানি পানি পান করবে? মনে পড়ে মনসুর সেদিনের কথা, যেদিন আমার শিশুপুত্র নুরকে তুমি এক ফোঁটা পানি না দিয়ে তিল তিল করে শুকিয়ে মেরে ছিলে? মনে পড়ে তাকে পানি পান করতে দিয়ে লাথি মেরে পানির পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছিলে? দাঁতে দাঁত পিষে বলে বনহুর কথাগুলো।

গোমেশের অবস্থা আরও কাহিল, তার চোখ দুটো বসে গেছে। দেহটা ঝুলে পড়েছে একেবারে। বারবার জিভ দিয়ে ঠোঁট দু'খানা চাটছে মাঝে মাঝে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট গোঙ্গানির শব্দ বের হচ্ছে।

ইরানী কেঁদে কেঁদে রাঙা হয়ে উঠেছে, সে হাত জুড়ে বললো—বনহুর, আমার বাপুকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

ক্ষমা! ক্ষমা করবো তোমার বাপুকে?

হাঁ, একটিবারের জন্য আমার বাপুকে তুমি ক্ষমা করো।

তোমার বাপু আমার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছে তাতে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই। আমার কচি পুত্রের প্রতি তার অবিচার আমাকে আজও দগ্ধীভূত করে চলেছে। কি নিষ্ঠুর পৈশাচিক আচরণ সে করেছিলো একরত্তি শিশুর উপর।

পানি---পানি---আমি জানতাম না বনহুর, পানির পিপাসা এত কঠিন। আমাকে মাফ করো বনহুর, আমাকে মাফ করো। এক ফোঁটা পানি দাও---মনসুর ডাকু অসহায়ভাবে বনহুরের কাছে পানি ভিক্ষা করতে লাগলো।

বনহুর বললো—আজ তুমি উপলব্ধি করছো পানির পিপাসা কত কঠিন। যেদিন আমার শিশুপুত্রকে এমনি করে পানি পান থেকে বিরত রেখেছিলে সে দিনের কথা স্মরণ করো বন্ধু। রহমান, ঠান্ডা পানি নিয়ে এসো।

রহমান ও পাশের সোরাহী থেকে একমাত্র পানি ঢেলে নিয়ে এলো।

মনসুর ডাকুর দু'চোখে আকুলতা, লোলুপ তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি নিয়ে রহমানের হাতের পানির পাত্রের দিকে তাকাতে লাগলো সে—পানি দাও, পানি দাও--আঃ আঃ মলাম---আঃ---

বনহুর বললো—রহমান, গোমেশকে পানি পান করাও।

কথাটা শুনে গোমেশের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো, মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনলো সে সম্মুখে—জল, জল দাও আমাকে—ভাই জল দাও---শপথ করছি, আর তোমার বিরুদ্ধে আমি কাজ করবো না বনহুর---আর তোমার বিরুদ্ধে কাজ করবো না। জল---জল---দা--ও---

রহমান গোমেশের মুখে পানির পাত্র তুলে ধরলো।

ঢক্ ঢক্ করে একনিঃশ্বাসে পানির পাত্র শূন্য করে ফেললো গোমেশ।

মনসুর ডাকু তখন সেদিকে তাকিয়ে আকুতি কাকুতি করছিলো। সে মনে করেছিলো গোমেশকে পানি পান করিয়ে এবার তাকে পানি পান করাবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হলো।

বনহুর বললো—গোমেশ, যেদিন আমাকে আর আমার শিশুপুত্র নূরকে পানি পান থেকে বিরত রাখা হয়েছিলো, সেদিন তুমি ছিলে না। তাই তোমাকে পানি পান করতে দেওয়া হলো। মৃত্যুর পূর্বে পিপাসা নিয়ে মরবে তা আমি চাই না।

গোমেশের চোখ দুটোতে একটা ভীষণ ভীতিভাব ফুটে উঠলো, বলে উঠলো সে—আমাকে তুমি হত্যা করোনা, আমাকে তুমি হত্যা করোনা বনহুর----

হত্যা করবো না? তবে যমালয়ে যাবে কি করে?

ভগবানের শপথ করে বলছি, আমি আর দস্যুতা করবো না। কাউকে আমি হত্যা করবো না---

হাঃ হাঃ হাঃ, অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বনহুর।

শিউরে উঠে ইরানী।

গোমেশের দু'চোখ কপালে উঠেছে।

মনসুর ডাকুরও সমগ্র দেহ যেন পাথরের চাপের মত শক্ত হয়ে উঠে।

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নিলো সূতীক্ষ্ম ধার ছোরাখানা এগিয়ে গেলো গোমেশের দিকে। এক মুহূর্তে বিলম্ব না করে ছোরাখানা সমূলে বসিয়ে দিলো বনহুর গোমেশের বুকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো গোমেশ।

বনহুর একটানে ছোরাখানা তুলে নিলো গোমেশের বুক থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরে পড়লো তার বুকের উপর

ইরানী দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলেছে।

মনসুর ডাকুর মুখোভাব করুণ হয়ে উঠেছে, বলে উঠে মনসুর ডাকু—বনহুর এবারের মত আমাকে মাফ করো, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো।

গোলাম! গোলাম হয়ে থাকবে! কিন্তু সে সময় আর কই মনসুর? দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে বনহুর মনসুর ডাকুর দিকে। হাতে তার সূতীক্ষ্ম ধার রক্তমাখা উদ্যত ছোরা।

ইরানী ছুটে এসে মনসুর ডাকুর সামনে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—না না, আমার বাপুকে তুমি হত্যা করোনা, হত্যা করোনা বনহুর----

পরবর্তী বই

নীল দ্বীপের রাণী